মীর মশাররফ হোসেন ও তাঁর বাউল গান

পারিজাত মজুমদার

জাগরী
কলকাতা ৭০০০০৩

প্রকাশক
অপূর্বকুমার সাহা
জাগরী
৭৪/৫ এ বাগবাজার ষ্ট্রিট
কলকাতা-৩

পরিবেশক
পুস্তক বিপণী
২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : আশ্বিন, ১৯৫৯

মুদ্রণ :
হিমাদ্রী রায়
রামকৃষ্ণ প্রেস
৯ এ, রামধন মিত্র লেন
কলকাতা-৪

প্রচ্ছদ : সুভাষ সাহা

উৎসর্গ

আমার বাবা
স্বর্গত ব্রজেন্দ্রকুমার মজুমদার
এবং আমার মা
সুষমা দেবী
যাঁর স্নেহে আমি এখনো সঞ্জীবিত

প্রাক্‌কথন

অনেক সাহিত্য-সাধক আছেন যাঁরা মহাকালের আবর্ত্তনে হারিয়ে যান, কেউ কেউ অবহেলায়, অনাদরে পরে থাকেন ইতিহাসের পাতায়, নানা কারণে এগুলি হ'তে পারে। এমন হ'তে পারে যে একজন সাহিত্যিক, যুগ ও পরিবর্তনশীল সমাজ-সাহিত্যের প্রবাহমান ধারায় তাঁদের রচনা দিয়ে চিরকালের দাবি মেটাতে সক্ষম হন না। অথচ ইতিহাসের গতিধারায় তাঁরা কেউই উপেক্ষনীয় নন, তাঁদের রচনা যে কোন ভাবেই হোক না কেন, কোন না কোন দিক দিয়ে আমাদের কাছে আদৃত হয়ে ওঠে।

একসময় মীর মশাররফ হোসেন বাঙালী পাঠকদের কাছে অত্যন্ত পরিচিত ছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে (বিশেষত মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে) তাঁর অবদান এবং কীর্তি নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য ছিল। আজ যে জন্যেই হোক তাঁকে আমরা বিস্মৃত হয়েছি। এ রকম অনেক মহৎ ব্যক্তিত্ব আছেন যাঁদেরকে অপরিচয়ের দূরত্বের জন্যে আমরা আর তাঁদেরকে কাছে পাইনে। এই না পাওয়ার পিছনে এড়িয়ে যাবার প্রবণতাই প্রধান হয়ে ওঠে। বোধ করি এই উদাসীনতার জন্যেই আজকের প্রজন্মের কাছে মীর মশাররফ হোসেন অচেনা, অজানা একটি নাম।

বর্তমান গ্রন্থে মীর মশাররফ হোসেন সম্পর্কে যৎসামান্য ধারণা দেবার চেষ্টা করেছি মাত্র। তাঁর জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনাগুলি প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সামান্য হয়েছে। মীরের বাউল গানগুলি নিয়েও কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়াসী হয়েছি। তাঁর রচিত কয়েকটি বাউল গান বর্তমান গ্রন্থে সংকলন করেছি। গানগুলি মীর মশাররফ হোসেনের 'সঙ্গীত লহরী' (১ম খণ্ড) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত।

এই গ্রন্থ রচনা করতে গিয়ে পূর্বসূরীগণ মীর মশাররফ হোসেন প্রসঙ্গে যে সব বিবরণ, মন্তব্য ও আলোচনা করেছেন আমি তা থেকে সাহায্য নিয়েছি এবং প্রয়োজনমত উদ্ধৃতি, তথ্য গ্রহণ করেছি। সময় ও নানান অসুবিধার কারণে সেইসব গ্রন্থের লেখক, প্রকাশ ও সত্বাধিকারীদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অনুমতি নিতে পারিনি বলে ক্ষমাপ্রার্থী।

গ্রন্থটি প্রকাশের মুহূর্তে স্মরণ করছি, জাগরী'র প্রকাশক শ্রীঅপূর্বকুমার সাহাকে। তাঁর আন্তরিক চেষ্টার ফলেই গ্রন্থটির প্রকাশ সম্ভব হতে পেরেছে। তাঁকে সামান্য কথায় শ্রদ্ধা বা সম্মান জানিয়ে ঋণ পরিশোধ করতে চাইনে।

এই গ্রন্থের কাজটি করতে গিয়ে অনেকের সাহায্য এবং সহযোগিতা পেয়েছি, এঁদের মধ্যে শ্রীমতী রুদ্রাণী সেনগুপ্ত আমাকে সম্ভাব্য বই-পত্র দিয়ে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছেন এজন্যে তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। এছাড়া এই গ্রন্থে

অন্তর্ভুক্ত অনেক তথ্য একসময় কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের পৌত্র অতুলকৃষ্ণ মজুমদারের কাছ থেকে পেয়েছি আজ তাঁর নাথাকার কথা ভেবে দুঃখ পাচ্ছি।

আন্দুল, মহিয়াড়ী লাইব্রেরীর সংরক্ষিত দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা দেখার সুযোগ করে দেবার জন্যে বন্ধু সম্পদ আচার্য ও অনুপম কুণ্ডু চৌধুরী আমার কাছে ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। এছাড়া চণ্ডী ভট্টাচার্য, অমিতাভ গুপ্ত, দীপক কর্মকার, লীলা ভট্টাচার্য, উর্মিলা মজুমদার ও আরো অনেকের সহযোগিতার কথা মনে পড়ছে। আমার অগ্রজ শ্রীপরিমল মজুমদার যাঁর ভালোবাসায় আমি বড় হয়েছি, এই কাজের জন্যে তিনি আড়াল থেকে আমাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন এজন্যে তাঁর কাছে আমি চির ঋণী।

এ গ্রন্থে ব্যবহৃত কিছু কিছু তথ্যের লেখা একসময় বাংলাদেশের রাজশাহী থেকে প্রকাশিত দৈনিক বার্তা ও কোলকাতার মাসিক সাহিত্য পত্রিকা জাগরীতে প্রকাশিত হয়েছে এবং বর্তমান গ্রন্থের অংশবিশেষ ইতিপূর্বে 'জাগরী' পত্রিকায় মুদ্রিত হয়েছে। উক্ত পত্রিকার সম্পাদক ও বিভাগীয় সম্পাদকদের ধন্যবাদ জানাই।

এই গ্রন্থের জন্যে শ্রীমতী শান্তশ্রী মজুমদার তাঁর সংসার ও কর্মজীবনের মধ্যে সমতা রক্ষা করে ক্লান্তিহীন পরিশ্রম করেছেন। পাণ্ডুলিপির অনুলিপি থেকে বই বাঁধাই এবং আরো অনেক ক্ষেত্রে তাঁর শ্রমের স্বীকৃতি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি।

'মীর মশাররফ হোসেন ও তাঁর বাউল গান' সন্দর্ভটি আমার কোন গবেষণা-কার্য নয়। এই ধরণের কাজের জন্যে যে শ্রম ও সময় দেবার প্রয়োজন হয়, সেটা আমি দিতে পারিনি, এছাড়া এইসব গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে সাধারণত যে সব নিয়ম কানুন প্রচলিত আছে আমি তা অজ্ঞতাবশত পুরোপুরি গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছি —এ ব্যাপারে পণ্ডিত ও গবেষকরা নিশ্চয় ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

শেষ পর্যন্ত হিমাদ্রী রায় ও নন্দকুমার সাহার সহযোগিতায় দ্রুত সময়ের মধ্যে মুদ্রণ কার্য সমাপ্ত হতে পেরেছে। সতর্ক থাকা সত্বেও মুদ্রণ প্রমাদ ও অন্যান্য বিষয়েও কিছু ভুল ভ্রান্তি রয়েই গেল।

বর্তমান গ্রন্থের প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় অন্নদাশঙ্কর রায় মহাশয়ের কাছ থেকে লালন ও বাউল গান সম্পর্কে অনেক কথা জেনে উপকৃত হয়েছি। তিনি বহু ব্যস্ততার মধ্যে থেকেও গ্রন্থের জন্যে পত্রাকারে তাঁর মূল্যবান মতামত লিখে দিয়ে আমাকে অনুগৃহীত করেছেন। তাঁকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাই।

অত্যন্ত যত্ন করে প্রচ্ছদ এঁকে দিয়েছেন আমার স্নেহভাজন সুভাষ সাহা।

এই গ্রন্থ রচনাকালে আমাকে আরো অনেকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে সহায়তা দান করেছেন, তাঁদের সবার কাছে আমি কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ।

পারিজাত মজুমদার

এক

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মীর মশাররফ হোসেন এক প্রতিভাবান সাহিত্যসাধক। মুসলমান সাহিত্যিকদের মধ্যে তিনিই প্রথম এবং প্রধানত সার্থক সাহিত্যকর্মী। বিশেষ করে গদ্য-সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁর অবদান ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে আছে। মীরের জন্ম-সাল ও জন্ম-তারিখ সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, তবে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা' ২য় খণ্ডে ২৯নং পুস্তকে বর্ণিত তথ্য থেকে জানা যায়, ১৩ নভেম্বর ১৮৭৭ সালে তাঁর জন্ম। উল্লেখ্য, এটি মীর মশাররফের পিতার জীবনী থেকে প্রাপ্ত, যেটি অক্টোবর ১৯০৩, এডুকেশন গেজেটে প্রকাশিত। তাঁর পিতাব জীবনী থেকে এটি আনুমানিক হিসাব করা হয়েছে। তবে মীরের জীবনের প্রায় অধিকাংশ তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তাঁর লিখিত 'আমার জীবনী' নামক আত্মকাহিনী মূলক গ্রন্থ থেকে। গ্রন্থটি ১৯০৮ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের বক্তব্য এবং গবেষকদের মতানুসারে তাঁর জন্ম-সাল কখনো ১৮৪৩, কখনো ১৮৪৫, কখনো দেখা যাচ্ছে ১৮৪৭, আবার কখনো ১৮৪৮। এ থেকে জন্ম-সালের তথ্য নিয়ে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। তবে 'আমার জীবনী' ও অন্যান্য গবেষকদের বক্তব্যের মধ্যে মীরের জন্ম ১৮৪৬ সালের আগের চেয়ে পরের তথ্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেক্ষেত্রে প্রচলিত মতানুসারে ধরা হয় মীর মশাররফের জন্ম ১৮৪৭ সালের ১৩ নভেম্বর, পূর্বতন নদীয়া জেলার বর্তমান বাংলাদেশের কুষ্টিয়া জেলার গৌরী (গরাই) নদীর তীরবর্তী লাহিনীপাড়া গ্রামে।[১]

মাতামহ জিনাতুল্লার বাড়ীতে মশাররফ হোসেনের জন্ম। পিতার

---

১. কুষ্টিয়া মহকুমা স্থাপিত হয় ১৮৬১ সালে, এবং ১৮৭১ সালে কুষ্টিয়া মহকুমা নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত হয়। তার পূর্বে কুষ্টিয়া পাবনা জেলার অধীনে ছিল। এ-ক্ষেত্রে মীর মশাররফ হোসেনের নদীয়া জেলায় জন্ম না ধরে, পাবনা জেলা ধরা উচিৎ।

নাম মীর মোয়াজ্জম হোসেন। মাতা দৌলতন্নেসা। দৌলতন্নেসা ছিলেন মোয়াজ্জম হোসেনের দ্বিতীয় পত্নী।[১] মীর মশাররফ হোসেন মাতামহের বাড়ীতে জন্মের পর থেকেই আদর যত্নে প্রতিপালিত হতে থাকেন। সেখানে আর কোন শিশু না থাকার জন্য তাঁর আদরের পরিমাণ মাত্রাতিরিক্ত হয়ে ওঠে। চার বছর চার মাস চারদিন বয়সের সময় মীরের 'হাতে খড়ি' হয়। মুন্সী জমিরুদ্দিন তাঁকে এই 'হাতে খড়ি' দেবার দায়িত্ব পালন করেন। মীরের পিতার 'হাতে খড়ি'ও জমিরুদ্দিন দিয়েছিলেন বলে জানা যায়। মীর মশাররফ হোসেনের প্রথম পাঠ হিসাবে আরবী-ফার্সী শিক্ষা শুরু হয় মুন্সী হেরাসতুল্লা নামের একজন শিক্ষকের কাছে। অবশ্য পরে জয়নাবাদ গ্রামের জগমোহন নন্দীর পাঠশালায় স্থায়ীভাবে তাঁর বিদ্যাচর্চার শুরু। পরবর্তীকালে ঐ পাঠশালা লাহিনীপাড়ায় স্থানান্তরিত হয়।

এক সময় মীর মশাররফ হোসেন ধাঁধা, হেঁয়ালী প্রভৃতি বিষয় রচনা করতেন ; যেমন :

কামারের মার ফেলে
পাঁঠার ফেলে পা
লবঙ্গের বঙ্গ ফেলে
বেছে বেছে খা।[২]

এ ছাড়া 'আমীর হামজা', 'সোনাভান' পুঁথি শ্রোতাদের পাঠ করে শোনাতেন। এমন কি দূর-দূরান্তে কবিতা লড়াই করতেও যেতেন। তাঁর পিতা অবশ্য এইসব বিষয়গুলো কখনো ভালো চোখে দেখতেন না। পিতার ইচ্ছা হয়তো অন্য রকম কিছু ছিল। শালঘর মধুয়া গ্রামের কুঠিতে বাস করতেন কেনী সাহেব। নীলকর কেনী সাহেবের সঙ্গে মীর সাহেবের পিতার খুব ঘনিষ্ঠতা ছিল। কেনী সাহেব

১. মোয়াজ্জম হোসেনের প্রথমা পত্নীর নাম হামিদন্নেসা।

২. ধাঁধার উত্তর—কাঁঠাল।

মশাররফ হোসেনকে বিলেতে পাঠাতে চেয়েছিলেন আই, সি, এস-এর জন্যে পড়াশুনা করবে এই ভেবে। তবে তা আর হয়ে ওঠে নি। এ সম্পর্কে 'আমার জীবনী' গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া যায়, মীরের নিজের জবানবন্দীতে ঃ "...ইংরেজী পড়িলে পাপ তো আছেই। আর মরিবার সময় গিডী-মিডী করিয়া মরিতে হইবে। আল্লাহ রসুলের নাম মুখে আসিবে না। ...ইংরেজী পড়িলেই একরূপ শয়তান হয়। দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করে, সরাব খায়।...হালাল হারামে প্রভেদ নাই। পাক না-পাকে জ্ঞান থাকে না।" যা হোক শেষ পর্যন্ত মীরের বিলেত যাওয়া না হলেও তাঁর ছোট ভাই বিলেত থেকে ব্যারিস্টার হয়ে এসেছিলেন।

মীরের তের কি চৌদ্দ বছর বয়সে মাতৃবিয়োগ ঘটে (১৮৫৯-১৮৬০)। পনের-ষোল বছর যখন বয়স সম্ভবত ১৮৬৩ সালের দিকে মীর মশাররফ তাঁর পিতার সঙ্গে ফরিদপুরের পদমদী গ্রামে চলে আসেন। পদমদীর নবাব মীর মোহাম্মদ আলীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা সূত্রে নবাব বাড়ীতে ওঠেন এবং সেখানকার স্কুলে ভর্তি হন। কিশোর বয়সেই মীরের জীবনে বাঈজী-নৃত্য, বাঈজী-পরিচয় পর্ব শুরু। বোধ করি পদমদীর পরিবেশ এবং নানা অভিজ্ঞতা মীরের জীবনে সুদূর-প্রসারী প্রভাব ফেলেছিল। তিনি আত্মজীবনীতে লিখেছেন ঃ "অভ্যাস দোষে সঙ্গ দোষে, একরূপ হইল যে আর পড়িতে ইচ্ছা হয় না। স্ত্রীলোকের সঙ্গে হাসি রহস্য তাস খেলিতে ইচ্ছা করে।"

এই পরিবেশে এই রকম মানসিক অবস্থায় কোন কিশোরের পক্ষেই পড়াশুনা করা বা হওয়া সম্ভব নয়, মীর মশাররফ হোসেনের বিদ্যাচর্চাও তাই ব্যাহত হতে বাধ্য হয়েছিল। পদমদী থেকে ফিরে মীর মশাররফ হোসেন পিতার সঙ্গে ঢাকায় যান। ঢাকা থেকে ফিরে আসেন গ্রামের বাড়ীতে। এরপর মশাররফের এক বৈমাত্রেয় (পদমদীর) মাতামহীর দেখাশুনায় থাকেন। তাঁর পিতা তখন সিরাজগঞ্জে ছিলেন।

এক সময় নানাভাবে মীরের শিক্ষা-জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পরে।

এ সব সংবাদ পিতার কর্ণগোচর হওয়াতে স্বাভাবিক ভাবেই তিনি উদ্বিগ্ন হন। এর পরই মশাররফ হোসেনের কৃষ্ণনগরের জীবন। ১৮৬৪ সালে পদমদীর স্কুল থেকে চলে এসে কৃষ্ণনগর কলিজিয়েট স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হন, কৃষ্ণনগরের অবস্থান তাঁর ক্ষেত্রে ক্ষণস্থায়ী হলেও সাহিত্য-জীবনে বিশেষ ভাবে প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। কৃষ্ণনগর ছিল সাহিত্য-সংস্কৃতি ও জ্ঞান চর্চার পীঠস্থান। হিন্দুপ্রধান শহর হলেও মুসলমান সম্প্রদায়েরও উপস্থিতি নগণ্য ছিল না। তাঁর কথায়ঃ "হিন্দু-মুসলমান এরূপ প্রণয় ভাবে জীবন কাটাইলে, সে জীবন যত সুখের সে সুখের মত আর কোন সুখ নাই।" এখান থেকেই শুরু হয় মীরের আর একটি জীবন। হিন্দুসংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ও পরিচিতির সূত্রপাত।

পরবর্তীকালে মীর মশাররফ হোসেনের কলকাতার জীবন, যেটি তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য সময়। কালীঘাট স্কুলে ভর্তি হওয়া, নাদের হোসেনের বাসায় অবস্থান এবং মোক্তারপুর গ্রামের নাদের হোসেনের প্রথমা কন্যা লতিফুন্নেসার সঙ্গে তাঁর পত্রালাপ শুরু। পড়াশুনার ব্যাপারটি মশাররফ হোসেনের জীবনে তখনকার মত আর এগলো না। নাদের হোসেনের কন্যা লতিফুন্নেসা ও আজিজুন্নেসার বিবাহ স্থির হয়ে গেল যথাক্রমে হোসেন আলী ও মীর মশাররফ হোসেনের সঙ্গে (১৮৬৫ সালের ১৯ মে)। মীরের এ বিবাহ সম্পর্কে পরিবারের কেউই জানত না। যা হোক মশাররফ হোসেনের সঙ্গে আজিজুন্নেসার বিবাহ ঘটলেও তিনি এ বিবাহে খুশী হতে পারেন নি।

এরপর তিনি স্ব-গ্রাম লাহিনীপাড়ায় ফিরে আসেন। লেখাপড়া শেষ। পিতৃবিয়োগ ঘটে গেছে। ঘটনাচক্রে প্রায় আট-নয় বছর পর (১৮৭৩-৭৪) দ্বিতীয় বিবাহ 'কালী' পরিবর্তিত নাম 'কুলসুম'-এর সঙ্গে হয়। মশাররফ হোসেনের জীবনের অধিকাংশ সময় কেটেছে ফরিদপুরের নবাব এস্টেটে এবং ১২৯১ সন থেকে দেলদুয়ার এস্টেটে ম্যানেজার হিসাবে কাজ করে।

মীরের জীবনে বিবি কুলসুমের অবদান ছিল অপরিসীম। কুলসুমের অবদানকে তিনি অকুণ্ঠ চিত্তে স্মরণ করেছেন :

কুলসুমকে নেকাহ্ করিবার পূর্বে আমি মানব সমাজে পরিগণিত হইবার উপযুক্তই ছিলাম না। খুন করি নাই, ডাকাতি করি নাই, পরদ্রব্য অপহরণ করি নাই, পরস্ত্রী হরণ করি নাই। তবে করিয়াছি কি? আজিজান বিবি যে আমাকে জাবরাণে বাঁধিয়া ধরিয়া স্বামী-স্ত্রীর দাবি করিয়া বসিয়াছিলেন...ছ'মাসে ন' মাসে ১২ মাস তাহার সহিত আমার দেখা হইত কিনা সন্দেহ। সংসারে টান ছিল না। সংসার থাক বা অধঃপাতে যাক সেদিকে দৃষ্টি ছিল না।...পাঁচ এয়ারের মন যোগাইতে পারিলেই জীবন জুড়াইল।... এইত ছিল আমার অবস্থা। ঈশ্বর চক্ষু তুলিয়া চাহিলেন। দয়ার হস্ত বিস্তার করিলেন। বিবি কুলসুম আমার গৃহে আসিলেন। গৃহিণী হইলেন। তাহার প্রথম কার্যই হইল আমার মতিগতি ফিরান, আমাকে সৎপথে আনা, ভূতপ্রেত ছাড়ান। ঈশ্বরের মহিমা কে বুঝিবে? ঔষধ ধরিতে আরম্ভ করিল?

উদ্ধৃত বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, মীর মশাররফ হোসেনের সাংসারিক জীবন, ব্যক্তি জীবন ও সাহিত্য-জীবনে বিবি কুলসুম কি বিরাট ব্যাপক ভূমিকা পালন করেছিলেন। মীরের সাহিত্য-জীবনের যেটুকু সোনার ফসল ফলেছিল তার অধিকাংশই কুলসুমের আগ্রহ ও অনুপ্রেরণায় উজ্জীবিত।

বিবি কুলসুমের গর্ভে এগারটি সন্তানের জন্ম হয়। তার মধ্যে পাঁচটি সন্তানই শৈশবে মারা যায়। ২৬ অগ্রাণ, ১৩১৬ বিবি কুলসুমের মৃত্যু হয়।[১] মীরের জীবনের শেষ কয়েক বছর কাটে পদমদীর (ফরিদপুর) নবাব মোহাম্মদ আলীর জমিদারী সেরেস্তায় চাকুরী করে।

বিবি কুলসুমের মৃত্যু মীরের জীবনকে ভীষণ ভাবে অসহায় করে

১. কুলসুমের মৃত্যুর তারিখ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় কুলসুমের স্মৃতি সৌধে মশাররফ হোসেনের লেখা কবিতাটি থেকে—

তুলেছিল, যার ফলে শেষ দিকে আর উল্লেখযোগ্য কোন সাহিত্য সৃষ্টি করেন নি, অবশ্য সে সুযোগও তাঁর ছিল না। কুলসুমের মৃত্যুর প্রায় ছু বছর পরে ১৩১৮ সনের শেষ দিকে মীর মশাররফ হোসেনের মৃত্যু হয়।[১] মৃত্যুর প্রায় নয় বছর পরে ১৩২৭ সনের ১৬ জ্যৈষ্ঠ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ভবনে তাঁর প্রতিকৃতি সংস্থাপিত হয়।

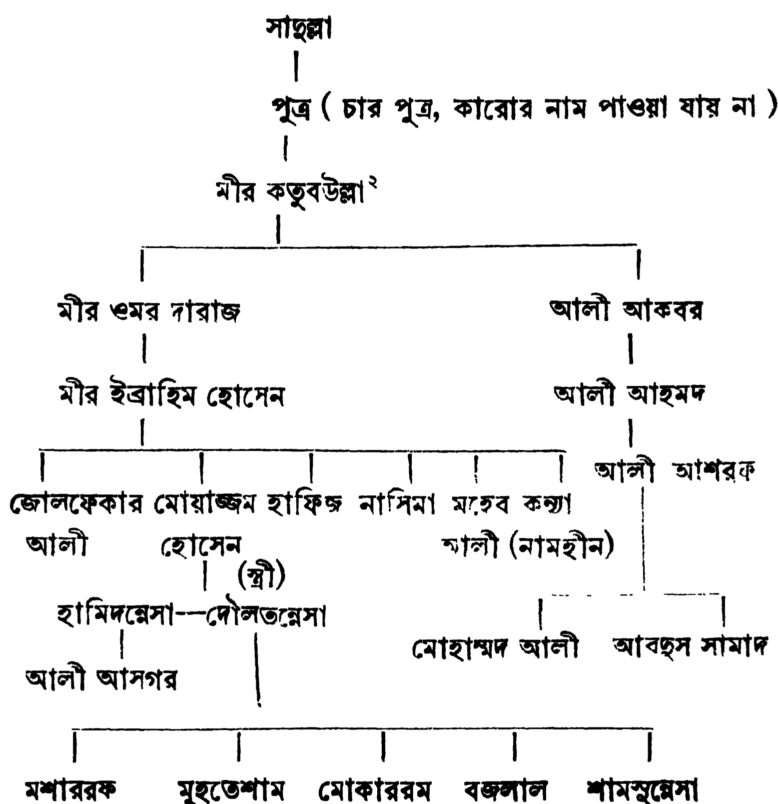
জীবনের নিয়োজিত কার্য শেষ করি
দয়ামায়া ভালোবাসা স্নেহ পরিহরি।
বসন ভূষণ ধন আত্মীয় স্বজন,
লালসা বাসনা ভোগ করি বিসর্জন
স্বামী সোহাগিনী বিবি কুলসুম হেথায়
সমাধি শয্যায় রয় অনন্ত নিদ্রায়
পঞ্চ পুত্র এক কন্যা রাখি প্রাণপতি
জগৎ ছাড়িয়ে স্বর্গে করিতে বসতি।
তেরশত ষোল সাল ছাব্বিশে অঘ্রাণ
রবিবার প্রাতে প্রাণ করিল প্রয়াণ।
পতিগত প্রাণধনী পতিসহ আসি
পদমদীর মৃত্তিকায় রহিলেন মিশি।
ভাই ভগ্নি যেই হও ক্ষণেক দাঁড়াও
আত্মার কল্যাণে তার আশিষেও যাও।

মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল, 'মীর মশাররফের গদ্য রচনা', পৃঃ ২৪ প্র-স. ১৩৮২

১. মীরের মৃত্যু তারিখ সম্পর্কে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩১৮ সনের শেষ ভাগ বলে উল্লেখ করেছেন তাঁর 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা'র ২য় খণ্ড ২৯ নং পুস্তকে। 'বাংলা একাডেমী পত্রিকা' প্রথম খণ্ড প্রথম সংখ্যায় (১৯৫৮) ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী মীরের মৃত্যু তারিখ ১৯১১ সালের ১৯শে ডিসেম্বর বলেছেন কিন্তু তথ্যটির সম্পর্কে বিস্তৃত কিছু আলোচনা করেননি। ডঃ মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল এই তারিখটিকেই তাঁর গ্রন্থে ('মীর মশাররফের গদ্য রচনা') ব্যবহার করেছেন, অন্য দিকে ডঃ আনিসুজ্জামান ১৯১১ সালের ১৯শে নভেম্বর বলে ('মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য') উল্লেখ করেছেন।

মীর মশাররফ হোসেনের বংশপঞ্জীর মোটামুটি একটা তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো ঃ

মীর মশাররফ হোসেনের বংশতালিকা[1]



---

১. বংশ তালিকাটি মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল-এর 'মীর মশাররফের গদ্য রচনা' গ্রন্থ থেকে নেওয়া হলো, এটি মীরের 'আমার জীবনী' গ্রন্থ অবলম্বনে তৈরী করা।

২ মীর মশাররফ হোসেনের বংশ পরিচয়ের উপাধি সৈয়দ। পূর্বপুরুষ বাগদাদ থেকে বাংলাদেশে এসেছিলেন বহুকাল পূর্বে। পূর্বপুরুষের উপাধি ছিল মীর, কাজকর্মের যোগ্যতা অনুসারে সম্ভবত কোন নবাব বাদশা এই উপাধি দিয়ে থাকতে পারেন [illegible]।

মোটামুটিভাবে মশাররফ হোসেনের জীবন সংক্ষিপ্তাকারে পরিক্রমা করলে তাঁর জীবনের ঘটনাগুলি দেখা যায় বহু বিচিত্রতায় বহুমুখী হয়েছিল। মীরের জীবনপ্রবাহ কখনই এক তালে চলেনি, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তিত হয়েছে। ১৮৬৫ সাল অবধি তাঁর জীবনের একটি ভাগ অর্থাৎ প্রথম বিবাহের সময় পর্যন্ত। ১৮৬৫-১৮৭৪ অর্থাৎ প্রথম বিবাহ থেকে দ্বিতীয় বিবাহ অবধি জীবনের আর একটি ভাগ। যদিও দুই বিবাহের মাঝখানের সময়টিকে তাঁর সাহিত্য জীবনের সম্ভবত অন্ধকার সময় হিসাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। দ্বিতীয় বিবাহের অর্থাৎ ১৮৭৪ সাল থেকে ১৮৮৪ সাল অবধি (দেলদুয়ারে চাকুরী নেওয়া পর্যন্ত) তাঁর আর একটি অধ্যায় বলে মনে করা হয়। ১৮৮৪ সাল থেকে ১৮৯৪ সাল মীর মশাররফ হোসেনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সময়। মীর-সাহিত্যের দিক থেকে বিচার করলে শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলি এই সময়কালে রচিত। সাংসারিক জীবনেও তাঁর তখন সুখ, সাহিত্যেও খ্যাতি। একদিকে বেশ কিছু গ্রন্থের লেখক অন্য দিকে স্ত্রী-পুত্র পরিবেষ্টিত পারিবারিক জীবনের আনন্দ, বিচার করলে উভয় দিক থেকেই উল্লেখযোগ্য কাল। ১৮৯৪ সাল থেকে ১৯০৮ সাল পর্যন্ত মীরের জীবনের তথ্য তেমন কিছু জানা যায় না। সম্ভবত এই কালটুকু মীরের জীবনের নিঃসঙ্গতা, বেদনা, বিরহের পর্যায় হিসাবে ধরা হয়ে থাকে। অবশ্য ফরিদপুরের নবাব এস্টেটে চাকুরী গ্রহণ করার পরে তিনি হয়ত নিঃসঙ্গ জীবনের ক্লান্তি কাটিয়েছেন গ্রন্থ রচনা করে। তাঁর মধ্যে অধিকাংশই কাব্যগ্রন্থ। গ্রন্থের বিষয়বস্তু ছিল ইসলামী ভাবধারায় অনুপ্রাণিত। অর্থাৎ ধর্ম চেতনাই ছিল প্রধান। যদিও ধর্মীয় ভাবধারায় লেখা কাব্যগুলির মান যথেষ্ট পরিমাণে অপুষ্ট এবং অপরিণত। এ সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য :

'সমাজের চোদ্দ আনা লোকের' প্রয়োজনে লেখা তাই রচনা সম্পর্কে হয়তো সচেতন বা সতর্ক হবার প্রয়োজন বোধ করেন নি, তখন তিনি অনেকখানি যুগ ও পরিবেশের চাহিদা মেটানোর জন্যেই নিজেকে

নিয়োজিত করেছিলেন। কারণ ধর্মীয় আবেগের স্রোতধারা পাঠকদের হৃদয়ে পৌঁছে দেওয়াটাই ছিল এসব রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য।

মীর মশাররফ হোসেনের সাহিত্য বর্তমানে ইতিহাসের সামগ্রী। তাঁর প্রকাশিত রচনাবলীর সংখ্যা প্রায় পঁচিশ থেকে আটত্রিশটি বলে অনুমান করা হয়। পঁচিশটি রচনাবলীর মোটামুটি তথ্য পাওয়া যায়, অন্যান্যগুলি আনুমানিক বলে ধরা হয়ে থাকে। এছাড়া সাময়িক পত্র-পত্রিকায় বেশ কিছু রচনা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, যেগুলি সম্ভবত গ্রন্থাকারে ধৃত হয়নি। মীরের রচনাগুলির মধ্যে বিষয় বৈচিত্র্যের ছাপ স্পষ্ট। নানা ধরনের বিষয়কে কেন্দ্র করে সৃষ্ট হয়েছে তাঁর সাহিত্য, উপন্যাস, প্রহসন, নাটক, কবিতা, প্রবন্ধ, জীবনচরিত, ধর্মবিষয়ক রচনা, গান ও বাউল গান।

মশাররফ হোসেনের সাহিত্য-জীবনের সূত্রপাত হয় কুমারখালির 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'র (১৮৬৩-১৮৯৬) সম্পাদক যুগপুরুষ, সাহিত্য সাধক, কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের সাহচর্যে। কাঙাল হরিনাথের সাহিত্য পাঠশালায় মীরের যাতায়াত ছিল। মীর সাহেবের উক্তি থেকে জানা যায়ঃ

> ...কুমারখালী আমার বাটী হইতে নিকটে। 'গ্রামবার্তা' সম্পাদক বাবু হরিনাথ মজুমদার মহাশয় আমাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ করিতেন। আমিও তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় মান্য করিতাম। সপ্তাহে সপ্তাহে গ্রামবার্তায় সংবাদ লিখিতাম। প্রভাকরেও লিখিতাম। মোক্তারপুরে (যশোহরে) বসিয়া থাকি—কোন কাজকর্ম নাই।—সংবাদ সংগ্রহ করিয়া নিয়মিতরূপে লিখিতে আরম্ভ করিলাম। হরিনাথ বাবু কপতাক্ষ নদীর অবস্থা লিখিতে পত্র লিখিলেন, এক এক দিন বহুদূর নৌকা করিয়া দেখিয়া আসিয়া লিখিতাম। তিনি কাটিয়া ছাঁটিয়া নিজ কাগজে প্রকাশ করিতেন...।

এছাড়াও রামচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ প্রভাকরে'র সহকারী সম্পাদক ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মীরকে নানাভাবে উৎসাহ দিতেন।

বলাবাহুল্য মীর মশাররফ হোসেনের সাহিত্যগুরু হিসাবে, কাঙাল হরিনাথের অবদানই নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ। কাঙালের উপদেশ ও উৎসাহে মীর মশাররফ হোসেন বাংলা সাহিত্যের একজন প্রতিষ্ঠিত লেখক হিসাবে পরিচিত হয়েছিলেন। এ সম্বন্ধে কাঙাল শিষ্য জলধর সেনের বিবৃতি ঃ

> এই সময়ে একদিন পরলোকগত মীর মশাররফ হোসেন মহাশয় কুমারখালীতে আসেন। তিনি কাঙালের সাহিত্য-শিষ্য ছিলেন। মীর সাহেবের বাড়ী কুমারখালীর অনতিদূরে গৌরীনদীর তটে লাহিনীপাড়া গ্রামে। জাতিতে মুসলমান হইলেও তিনি বাঙ্গালা ভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া ভক্তি করিতেন। কাঙাল হরিনাথ মীর মশাররফ হোসেনকে পুত্রবৎ স্নেহ করিতেন এবং বাঙ্গালা লেখা সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিতেন। এই উৎসাহের ফলেই মীর সাহেব বাঙ্গালা সাহিত্যের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক হইয়াছিলেন। তাঁহার "বিষাদসিন্ধু" তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে।...আমরা যখন স্কুলে পড়িতাম তখন প্রতি সপ্তাহেই মীর সাহেবের লেখা পড়িবার জন্য যে কত আগ্রহ হইত তাহা বলিতে পারি না। তিনি প্রবন্ধের নিম্নে নিজের নাম দিতেন না, লিখিতেন—'গৌরীতটবাসী মশা'। এই মশার লিখিত গদ্য-পদ্য সন্দর্ভ পাঠ করিয়া আমরা যে কত উপকৃত হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না। তাঁহার 'গৌরী সেতু', তাঁহার 'উদাসীন পথিকের মনের কথা', 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' আর তাঁহার অমূল্যরত্ন 'বিষাদসিন্ধু' যে আমরা কতবার পড়িয়াছি তাহার সংখ্যা করা যায় না। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের জন্য কত পরিশ্রম

> করিয়াছেন। আমাকে বলিয়াছিলেন তোমাকে 'নীল বিদ্রোহ' সম্বন্ধে অনেক নোট দিয়া যাইব—তুমি একখানি ইতিহাস লিখিও, আমি এ বয়সে আর পারিলাম না। আলস্যবশত সে 'নোট'ও লওয়া হইল না। তিনি আমাদিগকে ফাঁকি দিয়া দুই বৎসর হইল সাধনোচিত ধামে চলিয়া গিয়াছেন। এতদিনের মধ্যে এমন একজন একনিষ্ঠ সাহিত্যসেবকের নাম কেহই করেন নাই। আমাদের সৌভাগ্যক্রমে চুঁচুড়ার সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রদ্ধাস্পদ সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় মীর মশাররফ হোসেনের পরলোক গমনে শোক প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার গুণ বর্ণনা করিয়াছিলেন।

জলধর সেনের উল্লেখিত বক্তব্যের মধ্যেও মীরের অবমূল্যায়নের সুর স্পষ্ট অথচ সাহিত্যস্রষ্টা হিসাবে তাঁর অবদান তুচ্ছ ছিল না। বর্তমান কালেও আমাদের এখানে মীর মশাররফ হোসেন সম্পর্কে গবেষকরা আশ্চর্যজনকভাবে উদাসীন। মীরের সাহিত্য শুধু আজ ইতিহাসের বিষয় হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে।

দুই

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা' ২য় খণ্ড, ২৯নং পুস্তক এবং বিভিন্ন গ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা থেকে তথ্য নিয়ে মীর মশাররফ হোসেনের প্রকাশিত-অপ্রকাশিত গ্রন্থের একটা সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এখানে দেওয়া হলো :

'রত্নবতী' (১৮৬৯) গদ্যগ্রন্থ। মীরের এটি প্রথম গ্রন্থ। 'কৌতুকাবহ' গল্পকে অবলম্বন করে গ্রন্থটি লেখা হয়েছে। মূলত এটি প্রণয় মূলক উপাখ্যান। এই গ্রন্থ রচনার সময়কালে এবং তার পূর্বে কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের 'বিশুদ্ধ সংস্কৃত-বহুল বাঙ্গালাতে' লেখা বাংলা

সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস 'বিজয়বসন্ত' (১৮৫৯) এবং প্যারিচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) প্রভৃতি ছাড়াও বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'মৃণালিনী' প্রকাশিত হয়—এ থেকে বোঝা যায় মীরের আদর্শ হিসাবে উল্লেখিত গ্রন্থগুলি মূল্যবান ছিল। আধুনিক উপন্যাসের খুব বেশী জ্ঞান মশাররফের ছিল না বলেই কল্পনার রাজ্য জয় করে এই কাহিনী লিখতে হয়েছে। গ্রন্থটি সম্পর্কে 'Calcutta Review' (১৮৭০ ইং) মাসিক পত্রিকায় একটি সমালোচনাও প্রকাশিত হয়েছিল।

'বসন্তকুমারী' নাটক (১৮৭৩)। এই নাটকের আগে ইংরেজী, সংস্কৃত সাহিত্যের নিয়ম ও মত প্রচলিত ছিল। 'বসন্তকুমারী' তার ব্যতিক্রম নয়। এই গ্রন্থের ভূমিকায় (বিজ্ঞাপন) মীর মশাররফের বক্তব্য :

> আমার অনুরাগ-তরুর দ্বিতীয় কুসুম 'বসন্তকুমারী' নাটক প্রস্ফুটিত হইল।…নাটক রচনায় এই আমায় প্রথম উদ্যম ; ইহাতে নানা দোষ সম্ভার অবশ্যম্ভাবী ; যে সকল দোষ আর যে সকল ভ্রম থাকিল, অনুগ্রহ পূর্বক মার্জনা করিয়া উৎসাহ দান করিবেন, এই আমার প্রার্থনা।

'বসন্তকুমারী' নাটকটি গদ্য রচনা। গান ও কবিতা রয়েছে। এটিও কাল্পনিক প্রেমের উপাখ্যান। এটির সমালোচনা তৎকালে কোথাও প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানা যায় না। তবে 'এডুকেশন গেজেট' এ (১১ শ্রাবণ ১২৮০) প্রকাশিত সংবাদ অনুসারে জানা যায় নাটকটি মীরের স্ব-গ্রাম লাহিনীপাড়ায় অভিনীত হয়েছিল।

'গোরাই ব্রিজ' বা 'গৌরী সেতু' (১৮৭৩)। এটি 'বসন্তকুমারী' নাটকের কিছু আগে ছাপা হয়। এই হিসাবে এই কবিতা পুস্তকটি মীরের দ্বিতীয় প্রকাশিত গ্রন্থ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। এই কবিতা পুস্তকটি প্রকাশিত হওয়ার পর বঙ্কিমচন্দ্র ১২৮০, 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকার পৌষ সংখ্যায় মন্তব্য করেন :

> গ্রন্থখানি পদ্য। পদ্য মন্দ নহে। এই গ্রন্থকার আরও

বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার রচনার ন্যায় বিশুদ্ধ বাঙ্গালা অনেক হিন্দুতে লিখিতে পারে না। ইহার দৃষ্টান্ত আদরণীয়। বাঙ্গালা হিন্দু-মুসলমানের দেশ— একা হিন্দুর দেশ নহে। কিন্তু হিন্দু-মুসলমান এক্ষণে পৃথক—পরস্পরের সহিত সহৃদয়তাশূন্য। বাঙ্গালার প্রকৃত উন্নতির জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় যে হিন্দু-মুসলমানে ঐক্য জন্মে। যতদিন উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানদিগের মধ্যে এমত গর্ব থাকিবে যে, তাঁহারা ভিন্ন দেশীয়, বাঙ্গালা তাঁহাদের ভাষা নহে, তাঁহারা বাঙ্গালা লিখিবেন না বা বাঙ্গালা শিখিবেন না, কেবল উর্দু-ফারসীর চালনা করিবেন, ততদিন সে ঐক্য জন্মিবে না। কেননা জাতীয় ঐক্যের মূল ভাষার একতা। অতএব মীর মশাররফ হুসেন সাহেবের বাঙ্গালা ভাষানুরাগিতা বাঙ্গালীর পক্ষে বড় প্রীতিকর। ভরসা করি, অন্যান্য সুশিক্ষিত মুসলমান তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুবর্তী হইবেন।

'জমীদার দর্পণ' (১৮৭৩) নাটক। নাটক হিসাবে এটি দ্বিতীয়। এই নাটকের মধ্যে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' (১৮৬০) নাটকের প্রভাব প্রবল। নামকরণ ও কাহিনী উভয় দিকেই 'নীল-দর্পণ'-এর প্রভাব স্পষ্ট। দীনবন্ধু যেমন নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের কাহিনী অঙ্কন করেছেন তেমনি মীর মশাররফ হোসেন তুলে ধরেছেন জমিদারদের অত্যাচারের ছবি। ঘটনাটি সত্য বলেই মীর উল্লেখ করেছেন। স্মরণ করা যায়, এক সময় দীনবন্ধু মিত্র, কাঙাল হরিনাথ, মীর মশাররফ হোসেন প্রমুখরা নীলকর সাহেবদের ও জমিদারদের অত্যাচারের কাহিনী নিয়ে ভাবনা চিন্তা করতেন। কাঙালের 'গ্রামবার্তা' ছিল নীলকরদের প্রতি 'খড়্গাহস্তে'। গ্রামের দুঃখ-দুর্দশা অত্যাচারের কাহিনী সেই সঙ্গে বাংলাভাষা ও সাহিত্যের সেবার উদ্দেশ্য নিয়ে 'গ্রামবার্তা' প্রকাশিত হত। অবশ্য দর্পণ গোষ্ঠি নাটকের মধ্যে 'নীলদর্পণে'র পরে 'জমীদার দর্পণ' উল্লেখযোগ্য হলেও 'কেরানী দর্পণ', 'চা দর্পণ' সমসাময়িক কালে প্রকাশিত হয়েছিল।

উল্লেখিত নাটকটি সম্বন্ধে ১২৮০ 'বঙ্গদর্শন'-এর, একটি সমালোচনা প্রকাশিত হয়ঃ

> জনৈক কৃতবিদ্য মুসলমান কর্তৃক এই নাটকখানি বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় প্রণীত হইয়াছে। মুসলমানি বাঙ্গালার চিহ্নমাত্র ইহাতে নাই। বরং অনেক হিন্দুর প্রণীত বাঙ্গালার অপেক্ষা এই মুসলমান লেখকের বাঙ্গালা পরিশুদ্ধ।
>
> জমীদারদিগের অত্যাচার উদাহরণের দ্বারা বর্ণিত করা ইহার উদ্দেশ্য। নীলকরদিগের সম্বন্ধে বিখ্যাত নীল দর্পণের যে উদ্দেশ্য ছিল, সাধারণ জমিদার সম্বন্ধে ইহারও সেই উদ্দেশ্য।
>
> এই দর্পণে জমীদারদের যে প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে তাহা বিকৃত কি প্রকৃত সে বিষয়ের আমরা কিছুমাত্র আলোচনা করিতে চাহি না, এ তাহার সময় নহে।
>
> 'বঙ্গদর্শনে'র জন্মাবধি এই পত্র প্রজার হিতৈষী এবং প্রজার হিত-কামনা আমরা কখন ত্যাগ করিব না। কিন্তু আমরা পাবনা জিলার প্রজাদিগের আচরণ শুনিয়া বিরক্ত এবং বিষাদযুক্ত হইয়াছি। জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দেওয়া নিষ্প্রয়োজনীয়। আমরা পরামর্শ দিই যে, গ্রন্থকারের এ সময়ে এ গ্রন্থ বিক্রয় ও বিতরণ বন্ধ করা কর্ত্তব্য।
>
> কিন্তু সমালোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ইহা আমাদিগের বলা কর্ত্তব্য যে নাটকখানি অনেকাংশে ভাল হইয়াছে। আমরা প্রজা জমীদারের কথা বলিত চাহি না; কিন্তু ইহা বলিতে পারি যে, শেসন আদালতের চিত্রটি অতি পরিপাটি হইয়াছে। তদংশ উদ্ধৃত করিবার ইচ্ছা ছিল; স্থানাভাবে প্রযুক্ত করিতে পারিলাম না। কিন্তু 'সরোজিনী' নাটকের ন্যায়, ইহাতেও অনেক পরিহার্য্য কথা সন্নিবেশিত হইয়াছে।

'এর উপায় কি' (প্রহসন ১৮৭৪-৭৫ সম্ভবত)। গ্রন্থটির বিজ্ঞাপন

১৮৭৫, ২৫ সেপ্টেম্বরে কাঙাল হরিনাথের 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'য় প্রকাশিত হয়েছিল, এবং ১২৮৩ (১৮৭৬ ইং) সনের আশ্বিন সংখ্যা, মাসিক 'বান্ধব' (কালীপ্রসন্ন ঘোষ সম্পাদিত) পত্রিকায় গ্রন্থটির সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। মধুসূদনের 'বুড়ো শালিখের ঘাড়ে রোঁ', 'একেই কি বলে সভ্যতা' প্রহসনের প্রভাব থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। 'বান্ধব' এ প্রকাশিত হয়ঃ

> ইহাও আর একখানি প্রহসন। এদেশের মুসলমান ভদ্রলোকেরা সাধারণতঃ সাহিত্যে বীতস্পৃহ; বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত তাঁহাদিগের কোন সম্বন্ধ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং যখন তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কদাপি সখ করিয়া বাঙ্গালা লিখিতে ইচ্ছা করেন, তখন আমরা নিতান্ত সুখী হই এবং তাঁহাদিগের প্রশংসা করিতেই প্রাণপণে যত্ন করি। কিন্তু যদি তাঁহারা যশোলাভের এমন সহজ পথ থাকিতেও কল্পনায় ও ভাষায় যারপর নাই জঘন্য রুচির পরিচয় দেন—অশ্লীল পদাবলীর ছড়াছড়িকেই কাব্যরসে রসিকতা মনে করেন, তখন এই গ্রন্থাকারের ন্যায় আমরাও বিপন্ন হইয়া ইহাই জিজ্ঞাসা করি—এর উপায় কি?

'বিষাদ-সিন্ধু' (১৮৮৫)। মীর মশাররফ হোসেনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ইতিহাসের বিষয়বস্তু নিয়ে উপন্যাসটি রচিত। তিনটি পর্ব। স্বতন্ত্রভাবে পর্ব তিনটি প্রকাশিত হয়। প্রথম "মহরম পর্ব" (১৮৮৫)। দ্বিতীয় "উদ্ধার পর্ব" (১৮৮৭)। তৃতীয় "এজিদ-বধ পর্ব" (১৮৯০-৯১)। পরে তিন খণ্ড একত্রিত হয়ে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের শুরুতে লিখেছেনঃ

> পারস্য ও আরব্য গ্রন্থ হইতে মূল ঘটনার সারাংশ লইয়া 'বিষাদ-সিন্ধু' বিরচিত হইল। প্রাচীন কাব্যগ্রন্থের অবিকল অনুবাদ করিয়া প্রাচীন কবিগণের রচনা-কৌশল এবং

> শাস্ত্রের মর্যাদা রক্ষা করা অত্যন্ত দুরূহ। সাদৃশ লোকের পক্ষে তদ্বিষয়ে যথার্থ গৌরব রক্ষার আকাংখা বামনের বিধু ধারনের আকাংখা বলিতে হইবে। তবে মহররমের মূল ঘটনাটি বঙ্গ ভাষা-ভাষী প্রিয় পাঠক-পাঠিকাগণের সহজে হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেওয়াই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য।

সেই সময় মীরের 'বিষাদ-সিন্ধু' গ্রন্থ সম্পর্কে নানা ভাবে আলোচনা হয়েছিল। কুমারখালির কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের সম্পাদিত "গ্রামবার্তা প্রকাশিকা"য় (১১ জৈষ্ঠ, ১১৯২) প্রকাশিত ঃ

> গ্রন্থকর্ত্তা বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় অনেকগুলি গ্রন্থ লিখিয়া এবং গত জীবন 'আজীজন্ নাহার' সম্বাদ পত্রের সম্পাদকীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া সাহিত্য সমাজে বিশেষ পরিচিত, সুতরাং তাঁহার লেখনীর নূতন পরিচয় প্রদান বাহুল্য। প্রসিদ্ধ মহরমের আমূল বৃত্তান্ত বিষাদসিন্ধুর গর্ভ পূর্ণ হইয়া বিষাদসিন্ধু নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে। ইহার এক একটি স্থান এরূপ করুণ রসে পূর্ণ যে, পাঠকালে চক্ষের জল রাখা যায় না।…যাঁহারা মুসলমানদিগের মহরম পর্বের বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করেন, অনুরোধ করি তাহারা বিষাদ-সিন্ধু পাঠ করুন মনোরথ পূর্ণ হইবে। মুসলমানদিগের গ্রন্থ এরূপ বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় অল্পই অনুবাদিত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থ যে বঙ্গভাষা বিস্তৃতির আর একটি নূতন পথ এবং মাতৃভাষা বাঙ্গালার প্রতি মুসলমানদিগের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতেছে, ইহা চিন্তাশীল পাঠক সহজেই বুঝিতে পারেন।

এছাড়া ও মীরের এই গ্রন্থে মহরম পর্বটি তৎকালে 'The English Man', 'The Statesman and friends of India' দৈনিক পত্রিকায় সমালোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। 'বঙ্গবাসী', 'ভারতী', 'চারুবার্তা', 'সুলভ সমাচার' প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার আলোচনা, সমালোচনাগুলিও উল্লেখযোগ্য ছিল।

'সঙ্গীত লহরী' প্রথম খণ্ড (১৮৮৭)।[১] গ্রন্থটি মীরের পদ্য-গ্রন্থ। এতে বিভিন্ন ভাবের কিছু গান দেখতে পাওয়া যায়। গানের সুর ও তাল সম্পর্কেও উল্লেখ করা হয়েছে। অবশ্য 'সঙ্গীত লহরী'র কিছু কিছু গান মীরের বিভিন্ন গ্রন্থে, বিশেষত নাটক ও অন্যান্য গ্রন্থের মধ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। 'সঙ্গীত লহরী'র গানগুলি প্রেম ও বিরহ বিষয়ক স্বদেশ-প্রেম, হাস্যরস, ব্যঙ্গকৌতুক মিশ্রিত গান, প্রশস্তিমূলক এবং বাউল গান। উল্লেখিত গ্রন্থটি সম্পর্কে আলোচনা ও সমালোচনা তৎকালে প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জানা যায় না।

'গো-জীবন' (১৮৮৮-৮৯)। বোধকরি হিন্দু-মুসলমানের মিলন-সেতু তৈরী করার জন্যে মীর মশাররফ এই গ্রন্থটি রচনায় হাত দিয়েছিলেন। এই গ্রন্থ রচনা করে মীর একদিকে যেমন হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছে প্রশংসিত হয়েছিলেন, অন্যদিকে পড়তে হয়েছিল মুসলমান সম্প্রদায়ের বিষ নজরে। এমন কি 'গো-জীবন' রচনার জন্যে মীর মশাররফকে 'কাফের' বলা এবং তাঁর স্ত্রীকে তালাক দেবার 'ফতওয়া' জারী করা হয়। গ্রন্থটি সম্পর্কে 'ভারতী ও বালক' (চৈত্র ১২৯৫) পত্রিকায় (গো-জীবন) প্রকাশিত সমালোচনা থেকে জানা যায়ঃ

> কি হিন্দু, কি মুসলমান, সকলেই যাহাতে গো-জীবন রক্ষায় সচেষ্ট হন এই অভিপ্রায়ে এই পুস্তকখানি লিখিত। গো-বধের বিরুদ্ধে লেখক যে সকল যুক্তি দিয়াছেন, তাহা পড়িলে মনে হয়, লেখকের হৃদয় হইতে সে সকল কথা উৎথিত, তিনি কেবল মুখের কথা মাত্র বলিতেছেন না। পুস্তকখানি পড়িয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। লেখক মুসলমান হইয়া এ বিষয়ে যে রূপ উদারতার পরিচয় দিয়াছেন—যেরূপ

১ 'সঙ্গীত লহরী' সম্পর্কে বিশেষ কোন আলোচনা পাওয়া যায় না। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা' গ্রন্থে ২য় খণ্ড, ২৯নং পুস্তকে) মীর মশাররফ হোসেনের গ্রন্থাবলীর তালিকায় শুধু 'সঙ্গীত লহরী'র প্রকাশ কাল পৃষ্ঠা সংখ্যার সঙ্গে ৪টি গানের সংকলন করেছেন।

> অপক্ষপাতীভাবে তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন, তাহা পড়িয়া কেবল আনন্দ নহে, আমাদের আশ্চর্য্যও জন্মিল। ভরসা করি, মুসলমানগণ তাঁহার অনুসরণ করিবেন।

এছাড়া 'রইস ও রায়ত' পত্রিকায় সিদ্ধমোহন সেনের লেখা—মুসলমানের 'গো বলি' শীর্ষক প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য।

মীরের 'গো-জীবন' নিয়ে মুসলমান সমাজে নানাবিধ ক্ষোভ ও বাদানুবাদ দেখা দিলেও মীর মশাররফ হোসেন কিন্তু তাঁর উদার মানসিকতা থেকে কখনো সরে আসেন নি।

'বেহুলা গীতাভিনয়' (১৮৮৯)। বাংলাদেশে বেহুলা লখিন্দরের কাহিনী চিরকালের। এ সম্পর্কে মীরের বক্তব্য:

> বেহুলা লখিন্দরের কথা নূতন নহে। বঙ্গের স্ত্রী মহলে বেহুলার কাহিনী—বড়ই আদরের। কথাটা যে একেবারেই উপকথা—এরূপ বোধ হয় না। ভাগলপুর অঞ্চলে চাম্পাই নগর, সাতালী পর্ব্বতের চিহ্ন—এবং ত্রিবেণীর নিকট নেতা ধোপানীর পাট (এইক্ষণে পাথরে পরিণত) আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই ঘটনা লইয়াই যশোহর অঞ্চলে প্রথম ভাসান যাত্রার সৃষ্টি হয়। ভাসানের ভাষা-দোষে, রচয়িতার অযথা বর্ণনায় এবং পরিশুদ্ধ সঙ্গীতের অভাব হেতুতেই শিক্ষিত সমাজে ভাসান যাত্রার আদর নাই। কিন্তু শুক্তিতেই মুক্তা, স্বর্ণকারের নিক্ষিপ্ত অঙ্গারভস্মেই সুবর্ণকণা, সামান্য প্রস্তরেই কোহিনূর এবং দরিয়ায় নূরের জন্ম। এই পরিসিদ্ধ বাক্যের অনুকরণে—দৃষ্টান্ত স্থলে বলিতে পারি, মনসার ভাসানই 'বেহুলা গীতাভিনয়'।

'উদাসীন পথিকের মনের কথা' (১৮৯০)। এটি আত্মকাহিনীর ছলে লেখা উপন্যাস। নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনী ও পারিবারিক জীবনের কিছু ঘটনা এতে বর্ণিত হয়েছে। এই গ্রন্থের মধ্যে সবচেয়ে বেশী উল্লেখযোগ্য হয়ে উঠেছে নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের

কাহিনীকে জনসমক্ষে তুলে ধরার প্রবণতা। 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' গ্রন্থের মুখবন্ধ থেকে জানা যায়ঃ

> গুপ্তকথা, গুপ্তলিপি, গুপ্তকাণ্ড, গুপ্তরহস্য, গুপ্তপ্রেম, ক্রমে সকলই ব্যক্ত হইয়াছে। ...নানা বিঘ্ন, নানা ভয়, এমনকি জীবনে সংশয়। সংসারে আমার স্থায়ী বসতিস্থান নাই। সহায় নাই, সম্পত্তি নাই, আত্মীয় নাই, স্বজন নাই, বুদ্ধি নাই। আপন বলিতে কেহই নেই; সত্য কথা বলিতে দোষ কি? ...সুতরাং মনের কথা অকপটে প্রকাশ করিতে বোধহয় পারিব। সত্য-মিথ্যা ভগবান্ জানেন, আর না জানেন। কারণ, শোনা কথাই পথিকের মনের কথা। সে কথার ইতি নাই। জীবনের ইতির সহিতই কথার ইতি—আমার মনের কথার শেষ।...আপনাদের অনুগ্রহ প্রত্যাশী—উদাসীন পথিক।

গ্রন্থের মধ্যে শুধু নীলকরদের অত্যাচারের কাহিনী নয়, পূর্বেই উল্লেখ করেছি পারিবারিক জীবন কাহিনী ও নীলকরদের অত্যাচারের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থটির মধ্যে তৎকালীন সমাজের বাস্তব কিছু ঘটনার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

হিন্দু-মুসলমানের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক এবং উভয় সম্প্রদায়ের মিলন প্রত্যাশাও এই গ্রন্থের মধ্যে আছে। 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'র সত্য ও কল্পনায় মিশ্রিত রূপের উপাদান ধরা পড়েছে।

মীর মশাররফ হোসেনের সামগ্রিক জীবনে মনে হয় একটি বিপরীতধর্মী দ্বন্দ্ব কাজ করে গেছে। কখনো ব্যক্তি জীবনে, কখনো পারিবারিক জীবনে, কখনো কখনো সামাজিক জীবনে, মোট কথা প্রতিটি ক্ষেত্রেই তাঁর মানসিক দ্বন্দ্বের প্রকাশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এর প্রভাব প্রকট। 'সরলতা ও জটিলতা, গতানুগতিকতা ও মৌলিকতা, গ্রাম্যতা ও নাগরিকতা, মধ্যযুগীয়তা ও আধুনিকতা—' 'সাম্প্রদায়িকতা ও অসাম্প্রদায়িকতা' বিষয়টিও তাঁর জীবন ও সাহিত্যে

প্রতিবিম্বিত হতে দেখা যায়।

'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' (১৮৯৯)। মীরের এই গ্রন্থটির মধ্যে সমাজ সমালোচনা আছে এবং সেই সমালোচনার মধ্যে প্রাসঙ্গিক ভাবে সাম্প্রদায়িক মানসিকতা গুরুত্ব লাভ করেছে। এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ড সম্পর্কে 'প্রদীপ' পত্রিকায় ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় লিখছেন ঃ

> মীর সাহেবের পূর্বে মুসলমান লিখিত বঙ্গসাহিত্যে কবিতা ছিল; পড়িবার মত গদ্য ছিল না। এখন অনেকে সুখ-পাঠ্য গদ্যগ্রন্থ রচনা করিতেছেন; মুসলমান গদ্য লেখক-বর্গের মধ্যে এখন পর্যন্ত মীর সাহেব সর্বপ্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ গদ্য লেখক বলিয়া পরিচিত। ইনি অদ্যাপি সাহিত্য সেবায় ব্যাপৃত আছেন। কুষ্টিয়া নিবাসী মীর মশাররফ হোসেন বাল্যকাল হইতেই বঙ্গসাহিত্যে নিতান্ত অনুরক্ত। কাঙ্গাল হরিনাথ ইহার সাহিত্যগুরু; প্রথমে 'গ্রামবার্ত্তায়' পরে 'প্রভাকরে' লিখিয়া লিখিয়া লেখা শিখিয়া মীর সাহেব 'আজিজন্‌নেহার' নামক একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। মুসলমান সম্পাদিত পত্রিকার মধ্যে তাহাই সর্বপ্রথম বলিয়া পরিচিত। তাহার পর বহু গ্রন্থ লিখিয়া বঙ্গীয় লেখকবর্গের মধ্যে উচ্চাসন লাভ করিয়াছেন। কুষ্টিয়া একদা নীল বিদ্রোহের প্রধান ক্ষেত্র হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার যথার্থ কাহিনী 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' নামক এক বিচিত্র উপন্যাসে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। পল্লীনিবাসী মুসলমান লেখক কিরূপ ঘটনাচক্রে পতিত হইয়া সাহিত্য-সেবায় নিযুক্ত হইয়াছেন, তাহা সবিশেষ কৌতূহলপূর্ণ। ৪০ বৎসর পূর্বে দেশে এত কাগজ ছিল না, এত গ্রন্থ ছিল না, এত মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, ছিল গুরুমহাশয়ের পাঠশালা বা দুই-একটি বঙ্গ-বিদ্যালয়, দুই-চারিখানি কলেজ এবং দুই-দশখানা ভাল

পুস্তক। তৎকালে একজন মুসলমানের পক্ষে ভাল বাঙ্গালা রচনা করিবার বহু বাধাবিঘ্ন বর্তমান ছিল। তাহা অতিক্রম করিয়া মীর মশাররফ হোসেন যে সাহিত্যশক্তি লাভ করিয়াছিলেন তাহা অল্প শ্লাঘার বিষয় নহে।

'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' একখানি বিচিত্র সমাজচিত্র; সুশোভিত সুলিখিত উপন্যাস। ইহাতে নাই এমন রস দুর্লভ। কটু, তিক্ত, কষায়, অম্ল, অম্লমধুর, অতিমধুর, যাহা চাও তাহাই প্রচুর। অথচ সকল রসের উপর দিয়া কাতর-করুণ রস উছলিয়া পড়িতেছে।

গ্রন্থকার স্পষ্টবাদী হইতে শ্রুতিকটু দোষ পরিহার করিতে পারেন না, স্পষ্ট কথা সত্য হইতে পারে, সকল স্থলে সুমিষ্ট হয় না। সুতরাং 'গাজী মিয়াঁর কথা' স্থানে স্থানে বড়ই কড়া হইয়াছে। তিনি দৃঢ়মুষ্টিতে ফলা ধারণ করিয়া যেখানে যাহার পৃষ্ঠে আঘাত করিয়াছেন সেখানেই যেন সপাসপ আঘাতধ্বনি ফুটিয়া উঠিয়াছে, কাতর-ক্রন্দনের সঙ্গে রক্তধারা ছুটিয়া ছিটকাইয়া পড়িয়াছে। সে আঘাত কাহার পৃষ্ঠে বা পতিত হয় নাই? পাঠক! হয়ত তুমি আমি আর তাহার কেহই বাদ যাই নাই।......

মফঃস্বলের কথা মফঃস্বলের ভাষায় লিখিতে গিয়া গাজী মিয়াঁ প্রসঙ্গক্রমে আবশ্যক অনাবশ্যক অনেক প্রকারের পল্লীচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে মফঃস্বলবাসী ভালমন্দ সকল-প্রকার লোকের ছবি দেখিতে পাওয়া যায়। কখন কখন মনে হয়, বুঝি তোমাকে আমাকে লক্ষ্য করিয়াই এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে। কেবল পাত্রগণের নাম জয়ঢাক, ধিনতাধিনা, তেনাচোরা, দাগাদারী, তুড়ুক পাহাড় ইত্যাদি ইত্যাদি বলিয়া যাহা কিছু রক্ষা। বস্তানীর পল্লীচিত্র ইংরাজ রাজ্যের লজ্জার বিষয়; পড়িতে পড়িতে মনে হয়

ইংরাজ রাজ্যের বিলাতী বার্নিস ; ভেতরে টিন পাতা ; দেখিতে খুব জমকাল। আইন আছে···কিন্তু বিচার নাই। ছোটলোকের সঙ্গে ছোটলোকের মোকদ্দমায় সুবিচারের ব্যাঘাত ঘটে না ; কিন্তু ছোট-বড় ধনী-দরিদ্র কলহে লিপ্ত হইলে দরিদ্রের দুর্দশার একশেষ হয়। বিচার প্রণালীর দোষে বহু ব্যয় করিয়া মুক্তি লাভ করিতে দরিদ্রের প্রাণান্ত ঘটিয়া থাকে ; কখন বা এত করিয়াও সুবিচার প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই দোষ ইংরাজের নহে, দেশীয় কর্মচারীর, গাজীমিয়াঁ সেই কথা বুঝাইবার জন্য নানা কথার অবতারণা করিয়াছেন। রাজা-প্রজা সকলের পক্ষেই এইরূপ গ্রন্থ সবিশেষ শিক্ষাপ্রদ।

গাজীমিয়াঁ কে ? কে এই কল্পিত নামের অন্তরালে এরূপ সুতীব্র সমালোচনায় রাজা-প্রজা ধনী-দরিদ্র পণ্ডিত-মূর্খে কার্যকলাপের মর্মোদ্‌ঘাটন করিয়াছেন ? পুস্তক পড়িয়া এই কথা মনে হইবামাত্র দেখিলাম গাজীমিয়াঁর আত্মগোপন চেষ্টা সফল হয় নাই। পুস্তকের সর্বত্র তাহার পরিচয় পরিস্ফুট। তিনি একজন স্বধর্মনিষ্ঠ স্বদেশভক্ত অনুরক্ত মুসলমান সাহিত্য সেবক। মুসলমান সাহিত্য-সেবকের সংখ্যা অল্প ; তন্মধ্যে 'বিষাদ-সিন্ধু' রচয়িতা শ্রীযুক্ত মীর মশাররফ হোসেন ভাই সাহেব বাঙ্গালা গদ্য রচনার জন্য সুপরিচিত। যে লেখনী হইতে 'বিষাদ-সিন্ধু' প্রসূত হইয়াছে, 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'ও যে সেই লেখনী হইতে প্রসূত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ হয় না। এমন ভাষা এমন ভাব কাহিনীবিন্যাস-কৌশল মুসলমান সাহিত্য সেবকদিগের মধ্যে এ পর্যন্ত কেবল 'বিষাদ-সিন্ধু' রচয়িতাতেই লক্ষিত হইয়াছে।

এছাড়া উল্লেখিত গ্রন্থের 'পর 'The Calcutta Gazette'

(অক্টোবর, ১৯০০) পত্রিকায় একটি সমালোচনা প্রকাশিত হয় :

(It) is a story relating mainly to the quarrel between two female Muhammedan Zamindars in Northern Bengal. It is full of graphic realistic sketches illustrating the life led by the local Muhammedan gentry, the roguery of zamindari amla, the corruption of the police and the highhanded proceedings of the native judiciary and magistracy in the Mofussil. Among the characters that of Begum Saheb is very clevely drawn. The writer is no friend of female emancipation and he comments in strong language on Begum Saheb's not conforming to a system of Purdah prevalent among high class Muhammedan ladies. The writer though a Muhammedan writes Bengali with ease and possesses a wonderful command over the vocabulary of the language. But his style is nevertheless ungrammatical and marked by East-Bengalism (sic) and absence of literary grace.

'মৌলুদ শরীফ' (১৯০৫)। হজরতের জীবন প্রসঙ্গের কথা এই পদ্য-গদ্য যুক্ত গদ্য গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে। ধর্মভীরু লোকেদের কাছে এই গ্রন্থের অলৌকিকতার মূল্য হয়তো ছিল।

'মুসলমানের বাংলা শিক্ষা' (প্রথম ভাগ ১৯০৩) ও (দ্বিতীয় ভাগ ১৯০৮)। পাঠ্য পুস্তক জাতীয় গ্রন্থ।

'বিবি খোদেজার বিবাহ' (১৯০৫)। এই গ্রন্থটির মধ্যে খোদেজাকে 'কুমারী' নায়িকা ভাববার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে। মীর এই গ্রন্থ সম্পর্কে লিখেছেন :

> এরূপ সরল ভাষায় পদ্য লিখিবার উদ্দেশ্যেই বিজ্ঞাপণাভ্যাস।...কারণ মৌলুদ শরীফ জাতীয় বিবরণ জাতীয় ধর্মকথা, বাজে গল্প নহে, আক্ষায়িকা, উপন্যাস নহে। ধর্মসংস্রবী, আদত তমিজ, শব্দসমূহ বঙ্গভাষায় সম্পূর্ণভাবে প্রকাশক প্রতিশব্দ না থাকিলেও কিছু না কিছু আছে তাহা নহে, সেইটুকু বাদ দিয়া মুসলমানি শব্দ ব্যবহার করায় কোন কোন নব্য লেখক প্রিয় ভ্রাতা, ডাল খিচুড়ির সঙ্গে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।...সুতরাং নব্য দলে—আদরণীয় হইবে না—লেখকের ধ্রুব বিশ্বাস। তার মূল উদ্দেশ্য আশা কথঞ্চিৎ পরিমাণে পূর্ণ হইলেই জীবন সার্থক মনে করিব।

'হজরত ওমরের ধর্মজীবনলাভ' (১৯০৫)। এই সময়কালের রচনাগুলি অধিকাংশই ধর্মকেন্দ্রিক। এটি মীরের কবিতা গ্রন্থ।

'হজরত বেলালের জীবনী' (১৯০৫)।

'হজরত আমীর হাম্জার ধর্মজীবন লাভ' (১৯০৫)।

'মদিনার গৌরব' (১৯০৬/৭)। মদিনায় ইসলামের কিভাবে শক্তি বৃদ্ধি হল তার বন্দোবস্ত নিয়ে এই কাব্যগ্রন্থ রচিত।

'মোস্লেম-বীরত্ব' (১৯০৭/৮)। একই মানসিকতার ফসল, মীর লিখছেন :

> শান্তিপ্রিয় মুসলমান কি কারণে তরবারি হস্তে করিয়াছিলেন, বীরত্বের সহিত বিধর্মীর মুণ্ডপাত করিয়া বিজয় নিশান উড়াইয়াছিলেন, তাহারই কিঞ্চিৎ আভাস দেখাইতে "মোস্লেম-বীরত্ব" প্রকাশ হইল।

'এসলামের জয়' (১৯০৮)। ইতিহাস আশ্রিত ও কল্পনাযুক্ত, উপন্যাসের ছলে বর্ণিত বিষয়বস্তু। এতে ধর্মীয় আবেগকে কল্পনার স্বাভাবিক গতি দিয়ে কখনো কখনো অন্যধর্মের প্রতি অসহিষ্ণুতা ও

শ্রদ্ধাহীনতার উৎসাহ দিয়েছে। অন্যদিকে দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার বিষয়ে এই গ্রন্থের মূল্যবান উক্তি :

> জন্মভূমি কাহার না আদরের? মানুষের ত কথাই নাই,—পশুপক্ষী কীটপতঙ্গগণও জন্মস্থানের মায়া মমতা বোঝে, আদর ও যত্ন করে। কোন শাস্ত্রে বলিতেছে জন্মভূমি স্বর্গ হইতে গরীয়সী।...হায়রে জন্মভূমি!...

উল্লেখিত বক্তব্যের মধ্যে প্রকৃত স্বদেশ সম্পর্কে তাঁর চিন্তা থাকলেও পুরোপুরি কতটা স্বদেশ ও রাজনীতি সম্পর্কে মীরের সচেতনতা ছিল বলা মুসকিল।

'হজরত ইউসুফ' (১৯০৮)। মীরের এই গ্রন্থটি ধর্মীয় আবেগকে আশ্রয় করে লেখা। গ্রন্থটি সম্পর্কে মীর তাঁর 'আমার জীবনী' গ্রন্থে "হজরত ইউসুফ যন্ত্রস্থ" এ রকম একটি বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিলেন। এ থেকে ধারণা হয় মীরের উল্লেখিত গ্রন্থটি প্রকাশিত হলেও হতে পারে।

'খোৎবা'। এটিও ধর্মীয় আবেগ আশ্রিত গ্রন্থ।

'বাজীমাৎ' (১৯০৮)। কবিতা গ্রন্থ। সামাজিক পরিবেশকে কেন্দ্র করে গ্রন্থটি লেখা।

'আমার জীবনী' (১৯০৮-১৯১০)। মীরের এটি আত্মকথা, জীবনী গ্রন্থ। ব্যক্তিগত জীবনকাহিনী, বংশপরিচয়, প্রেম-ভালোবাসার ইতিবৃত্তের আবেগময় বর্ণনা গ্রন্থটির মধ্যে পাওয়া যায়। ১২টি খণ্ডে এই গ্রন্থটি সম্পূর্ণ হয়েছে। গ্রন্থের শুরুতে লেখকের বক্তব্য :

> ...প্রভু, সহায় হও। সত্য তত্ত্ব প্রকাশে হৃদয়ে বল দেও। অসত্য ঘটনা, অসত্য ধারণা প্রকাশ হইতে তুলিখানি সংকোচিত কর। সদাসর্বদা পরহিংসা, পরদ্বেষ, পরকুৎসা, পরনিন্দা হইতে তফাৎ রাখিও।

'বিবি কুলসুম' (১৯১০)। এটিও মীর মশাররফ হোসেনের আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ। বিবি কুলসুমের মৃত্যুর পর এই গ্রন্থটি রচনা

করেছেন। গ্রন্থের মধ্যে শুধু স্মৃতির মুখরতা। কুলসুমের অনুপস্থিতিতে মীরের ব্যক্তি জীবনে একসময় বিষণ্ণতা ও ক্লান্তি এসেছিল। কুলসুমের প্রতি তাঁর যে অফুরন্ত ভালোবাসা, গভীর টান তার সবকিছু এই গ্রন্থে মীর অকপটে প্রকাশ করেছেন। এই গ্রন্থে মীরের নিম্নোদ্ধৃত বক্তব্য ঃ

> সারাটি দিন খাটিয়া পরিশ্রমের পর সন্ধ্যার সময় যাহা দেখিয়া মনে শান্তি জন্মিত, অতুল সুখবোধ হইত, মানসিক গ্লানি, ক্লান্তি দূর হইত—দূর হইতে যে হাসির আভা প্রফুল্ল ভাব দেখিয়া প্রাণ জুড়াইত—তাহা যেন নাই। উপবেশন কক্ষ, শয়ন শয্যা ভাণ্ডার, স্নানাগার, রন্ধনশালা—মনে মনে আকর্ষণে খুঁজিয়া দেখি—যাহা আমার পোড়া চক্ষু দেখিতে চায় তাহা নাই। স্বভাবতঃই দেহক্লেসে একরূপ গন্ধ আছে। সেই গন্ধ পরিধেয় বসনে, বিছানার চাদরে পাওয়া যায়। কিন্তু কেহ নাসিকায় দুর্গন্ধ বোধ করে। কেহ নানাবিধ ফুলের, কথা—যথা—যুঁই জবার—কেহ পদ্ম কেহ নলিনী, কেহ কামিনী, কেহ রজনীগন্ধার কেহ বা গাঁদার গন্ধের আভাস পাইয়া আত্মপ্রাণ সঁপিয়া দেয়।
>
> আমি যে ঘ্রাণে আত্মহারা, মাতওয়ারা—যে ঘ্রাণ প্রাণ মন শীতল করিত তাহা আর এখন পাই না। বাড়ীর সকলেই আছে, সুন্দর শ্যামবর্ণ কাল, একেবারে সাদা ধবধব তাহাও আছে, সকল প্রকার মুখই আছে দেখি, কিন্তু আমি যে মুখ চাই, তাহা দেখিতে পাই না। সে মুখ চাঁদবদনী নয়—সূর্যমুখী নয়, শুকতারার ন্যায় শুভ্র নয়, অপ্সরা সদৃশ্য সুদৃশ্য কান্তি নয়, সুরপুরবাসিনী সুন্দরীগণের ন্যায় মুখের অবয়ব নয়। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ। গোলাল নহে, একটু ছাঁদের, হাসিভরা মুখখানি দেখিতে চাই। সেই দীর্ঘায়তন চক্ষু দুটির স্নেহভাব সেই পরিপূর্ণ হৃদয়ের ভালবাসা, পূর্ণ চাহনি দেখিতে

চাই, পাই না। কোথায় গেল। ঘরময় খুঁজি, পাই না কোথায় গেল।

আমি আমার চক্ষে আমার ধারণায়, আমার বিবেচনায় যে অমূল্য রত্ন হারাইয়াছি, আমার বহুকালের যত্নের ধন বহু পরিশ্রম, বহু কষ্টে বহু যন্ত্রণা, যাতনা, গঞ্জনা, আত্মীয়স্বজনের বাক্যবাণ সহ্য করিয়া আমার চক্ষে অমূল্য ধন রত্ন মাণিক যাহাই বলি—সংগ্রহ করিয়াছিলাম আজ ৪০ বৎসর পরে তাহা হারাইয়াছি!

কে হরিয়া লইল। না স্বইচ্ছায় চলিয়া গেল? না কেহ কোনরূপ কুহক জাল বিস্তার করিয়া আবরণের মধ্যে ঢাকিয়া রাখিয়াছে দেখিতে পাইতেছি না?

বিবি কুলসুম আমার জীবনের জীবনী। জীবনের জীবনী নয়নমন রঞ্জনী চিত্তহারিণী চিত্তাকর্ষিণী, আমার কানে মধুর ভাসিনী সুহাসিনী, আমার সম্পূর্ণ ভালবাসার অধিকারিণী, সমভাবে সুখদুঃখভোগিনী, মমচক্ষে কমল সদৃশ কমলা, সরলা, সতীসাধ্বী, বুদ্ধিমতী, বিদ্যাবতী, দয়াবতী, সর্বকাজে সুমতি, স্নেহবতী, সত্যপ্রিয়, সত্যবাদিনী, সেবিকা, দাসী, পরিচারিকা, পাচিকা, ধাত্রী, গৃহকর্ত্রী, পতিগতপ্রাণা, স্বামী-সোহাগিনী, প্রণয়িনী, স্বামী-প্রেমে আত্মহারা, স্বামীর গুপ্ততত্ত্ব হৃদয় অভ্যন্তরে সুরক্ষিণী; পরস্পর প্রেমানুরাগ, অপ্রকাশ্য ব্যবহার, ভালবাসা, প্রেম, লিখন, পঠন, আন্তরিক যত্নে অতি গুপ্তভাবে সংরক্ষিণী। জীবনের সঙ্গিনী, পবিত্র অর্ধাঙ্গিনী, ধর্মপত্নী, একাদশ সন্তানের জননী, আমার বুদ্ধি-বিবেকে এত গুণের অধিকারিণী বিবি কুলসুম সুশ্রী ছিলেন না। তাঁহার অপেক্ষা শতগুণ সুশ্রী নারী দুনিয়ায় রহিয়াছে! কিন্তু আমার চক্ষে যাহা তাহা প্রায় সকলি বলিয়াছি।

এ জীবনীর মূল্য নাই, অমূল্য, প্যাকিং খরচ ডাক মাশুল

বাবদ মাত্র দুই আনা। হাতে হাতে লইলে কিছু খরচ নাই।

মীরের আরও কিছু গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া যায় তবে সেগুলি প্রকাশিত হয়েছিল কিনা তার সঠিক সন্ধান মেলে না।

গ্রন্থগুলির নাম (১) 'রাজিয়া খাতুন'[১] (২) 'তহমিনা' (৩) 'বাঁধা খাতা' (৪) 'নিয়তি কি অবনতি'। এগুলি ছাড়াও আরো কিছু গ্রন্থ আছে বলে মনে করা হয়ে থাকে। যেমন, 'টালা অভিনয়', 'ভাই ভাই এই তো চাই', 'ফঁস কাগজ', 'একি', 'পঞ্চনারী', 'প্রেম পারিজাত'। এসব গ্রন্থের মধ্যে 'নিয়তি কি অবনতি' কহিনূর পত্রিকায় কিছু অংশ প্রকাশিত হয়েছিল বলে জানা যায় এবং 'টালা অভিনয়' গ্রন্থটি 'হাফেজ' পত্রিকায় (১৮৯৭) প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়া আরো তিনটি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায় 'ইউসুফ জুলেখা', 'গাজীমিয়াঁর গুলি' ও 'হীরক খনি'। একসময় এই ত্রয়ী গ্রন্থ সম্পর্কে মীরের স্ত্রী বলেছিলেন "বই এর নাম দিলে, বিজ্ঞাপন দিলে, বই কৈ ?" এ থেকে স্বভাবতই ধারণা করা হয় গ্রন্থগুলি আদৌ প্রকাশিত হয়নি। হয়তো লেখা অসম্পূর্ণ ছিল। উল্লেখিত গ্রন্থ ছাড়া মীরের বেশ কিছু লেখা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। মীর মশাররফ হোসেন এক সময় 'সংবাদ প্রভাকর' ও 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'র সংবাদদাতা হিসাবে কাজ করতেন। এক্ষেত্রে উপরোক্ত পত্রিকায় তাঁর লেখা প্রকাশিত হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। 'সংবাদ প্রভাকর'-এ (১৮৬৫) তাঁর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। মীর আত্মকথায় এ সম্পর্কে লিখেছেন "প্রভাকরে এক প্রবন্ধ লিখিলাম। মুসলমান বিবাহ পদ্ধতি—মনের কথা যা মনে উদয় হইল, যেরূপ বিবাহ হইয়া থাকে, তাহার দোষ ধরিয়া যথাসাধ্য লিখিলাম।" 'ভারত মহিলা' (১৩১৪, বৈশাখ-শ্রাবণ সংখ্যা) পত্রিকায় 'প্যারী সুন্দরী' নামের একটি লেখা প্রকাশিত হয়। কুষ্টিয়ার আমলা-সদরপুরের ভূম্যধিকারিণীর সঙ্গে নীলকর কেনী সাহেবের যে সংঘর্ষ সৃষ্টি

১ মনে হয় 'রাজিয়া খাতুন' মীরের অসম্পূর্ণ উপন্যাস। ধারাবাহিক ভাবে 'হিতকরী'তে এর কিছু অংশ প্রকাশিত হয়েছিল।

হয়েছিল তারই কাহিনী নিয়ে লেখা। 'আজীজন নেহার' (১৮৭৭) পত্রিকাতেও বেশ কিছু লেখা প্রকাশিত হয়েছিল বলে মনে হয়। এই রকম ভাবে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মীর মশাররফ হোসেনের অনেক লেখা ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে যা আজও গ্রন্থাকারে ধৃত হয়নি।

১৮৭৪ সালের দিকে মীর মশাররফ হোসেন 'আজীজন নেহার' (প্রথম স্ত্রীর নাম অনুসারে) নামে একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। পত্রিকাটি সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন ঃ

> হুগলী কলেজের মুসলমান ছাত্রবর্গ এই পত্রিকা প্রচারে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল— বৈশাখ ১২৮১ (এপ্রিল ১৮৭৪)।" 'আজীজন নেহার পত্রিকাটি সম্পর্কে 'এডুকেশন গেজেটে' (পরবর্তী মে) একটি প্রাপ্ত পত্রে প্রকাশিত হয়, "আজীজন নেহার" উক্ত শীর্ষক একখানি মাসিক সংবাদপত্র প্রকাশ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, ···আমি 'আজীজন নেহার'কে বিভিন্ন দৃষ্টিতে দর্শন করিতেছি। এই পত্রিকা কয়েকজন মুসলমান যুবকের লেখনীবিনির্মুক্ত সরল বাঙালা ভাষায় লিখিত। দেখুন, যে মুসলমানদিকের নিমিত্ত ভারতের অনেক অংশে হিন্দী ও উর্দু ভাষা পুনর্ব্বার আত্যন্তিক প্রভায় উদিত হইয়াছে, যাহাদের জন্যে অত্যাল্পকাল স্বদেশ-প্রতি-নিবৃত্ত ক্যাম্বেল বাহাদুর সুমিষ্ঠ, সরল সংস্কৃতালঙ্কৃত আধুনিক বাঙালা ভাষার পরিবর্ত্তে শ্রুতিকঠে-র হিন্দী-পারসী-কলঙ্কৃত আদলতী বাঙালার প্রচলন বিষয়ে সবিশেষ চেষ্টিত ছিলেন, দেখুন সেই ক্যাম্বেল প্রিয় মহম্মদীয়গণ মধুময় বাঙালা ভাষার যথার্থ স্বাদগ্রহণে কেমন সমর্থ হইয়াছেন।

'হিতকরী' (১৮৯০, এপ্রিল) নামে মীর মশাররফ হোসেন আর একটি পাক্ষিক পত্রিকা পরিচালনা করতেন। যতদূর মনে হয় পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন মীর মশাররফ হোসেন। 'হিতকরী' সম্পর্কে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন ঃ "কুষ্টিয়া লাহিনীপাড়া

হইতে প্রকাশিত। রাজশাহীর 'শিক্ষা পরিচয়' লেখেন:

> "আমরা জানিয়াছি, একজন সুপ্রসিদ্ধ দেশহিতৈষী সাধারণের নিকট অদৃশ্য থাকিয়া হিতকরীর পরিচালনা করিতেছেন।" আমাদের মনে হয়, পত্রিকাখানি মীর মশাররফ হোসেনের, এবং হরিনাথ মজুমদার (কাঙাল হরিনাথ) অন্তরালে থাকিয়া উহার পরিচালনায় সহায়তা করিতেন। দ্বিতীয় বর্ষে 'হিতকরী' টাঙ্গাইলে স্থানান্তরিত হয়।[১]

মীর মশাররফ হোসেন, কাঙাল হরিনাথ ছাড়াও কুষ্টিয়ার সাহিত্য সেবক ও কতিপয় বিদ্যোৎসাহী উকিল পত্রিকাটির জন্যে আর্থিক সাহায্য করেছিলেন। 'হিতকরী' পত্রিকার প্রকাশক ছিলেন শ্রীদেবনাথ বিশ্বাস। ছাপা হতো কুমারখালির মথুরানাথ মুদ্রাযন্ত্রে। মুদ্রক রজনীকান্ত ঘোষ। প্রতি সংখ্যার মূল্য দুই পাই। বার্ষিক মূল্য দুই টাকা (ডাক মাসুল সহ)। 'হিতকরী'-এর সম্পাদক হিসাবে কারুর নাম উল্লেখ থাকত না। এই পত্রিকাটির সঙ্গে কাঙাল হরিনাথ মজুমদার ও তাঁর পুত্র শ্রীসতীশচন্দ্র মজুমদার সহ কাঙালের সাহিত্য পাঠশালার অনেকেই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। 'হিতকরী'তে ১ম ভাগ ১৩শ সংখ্যায় (১২৯৭, ১৫ কার্তিক, ইং ১৮৯০, ৩১ অক্টোবার) 'মহাত্মা লালন ফকির' নামে সম্পাদকীয় স্তম্ভে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এটি লালনের মৃত্যু সংবাদ সহ লালন জীবনীর সর্বপ্রাচীন ও মূল্যবান তথ্য হিসাবে এ যাবৎকাল স্বীকৃত হয়ে আসছে। শ্রীবসন্তকুমার পাল মহাশয় তাঁর 'মহাত্মা লালন ফকির' (১৯৫৪) গ্রন্থে 'হিতকরী'তে প্রকাশিত প্রবন্ধটির প্রথম পুনর্মুদ্রণ করেন। 'হিতকরী'তে প্রকাশিত প্রবন্ধটিই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং লালন জীবনীর প্রয়োজনীয় বিশ্বস্ত বিবরণ প্রবন্ধটির মধ্যে পাওয়া যায়। প্রবন্ধকারের নাম না থাকায় লেখক সম্পর্কে বিতর্ক রয়ে গেছে।

তবে লালনের গান ও তাঁর নাম নিয়ে আলোচনা প্রথম মুদ্রিত

---

১. 'হিতকরী' টাঙ্গাইলের আহম্মদী প্রেসে ছাপা হত, মুদ্রক শ্রীসাধু সরকার এবং পণ্ডিত মসলেউদ্দীন ছিলেন প্রকাশক।

করেন কাঙাল হরিনাথ মজুমদার।[১] হরিনাথের উদ্ধৃতি :

লালন ফকির নামে জনৈক ভক্ত…একটি গান প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা আমরা নিম্নে প্রকাশ করিলাম।

কে বোঝে সাঁইয়ের লীলা খেলা ; সে যে, আপনি গুরু হয়
আপনি চেলা।

… … … …

নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুষ্টিয়া বিভাগের নিকটবর্ত্তী ঘোড়াই গ্রামে লালন সাঁই নামে যে ফকীর বাস করেন, তিনিও পরম ভক্ত যোগী।

বাংলা সাহিত্যের প্রায় সর্বক্ষেত্রে মীর মশাররফ হোসেন পদচারণা করেছিলেন। কোথাও ব্যর্থ হয়েছেন কোথাও বা সার্থকতার ফসল ফলিয়েছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তাঁর দ্বিধাগ্রস্ত মানস সাহিত্যের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তবে এক্ষেত্রে বলতে হয় যুগের প্রয়োজনীয় নির্দেশকে তিনি অস্বীকার করতে পারেন নি কারণ উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের রূপ যখন পরিপূর্ণ একটি ধারায় ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছিল তখন মুসলমান সাহিত্য সাধকরাও তাঁদের সাহিত্য সম্পদ নিয়ে সেই প্রবহমান ধারার সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাংলা সাহিত্যের সামগ্রিকতায় অংশ নিয়েছিলেন।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে পাই, প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) ও একই সময়ে কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের 'বিজয়-বসন্ত' (১৮৫৯) বাংলা সাহিত্যের এই প্রথম দুটি উপন্যাস প্রকাশিত হয়। তার প্রায় এগারো বছর পরে মীর মশাররফ হোসেনের 'রত্নবতী' (১৮৬৯) প্রকাশিত হলেও একথা অস্বীকার করা যায় না যে বিদ্যাসাগর, মধুসূদন বা বঙ্কিমচন্দ্রের মত প্রতিভা তখনকার

১ এ সম্পর্কে বর্তমান লেখক বহু পূর্বে রাজশাহী থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক বার্তা'র রবিবারের আসর-এ 'কাঙাল হরিনাথ ও বাউল গান' এবং কোলকাতার মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'জাগরী'তে 'বাউল প্রসঙ্গতঃ লালন' শীর্ষক প্রবন্ধে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

মুসলমান সাহিত্য সাধকদের মধ্যে দেখা যায়নি—"তাই একালের বাঙালী মুসলমান লেখকরা ভাল সাহিত্য সৃষ্টি করলেন, কিন্তু মহৎ শিল্পস্রষ্টা রূপে দেখা দিলেন না।[১] তবুও উনবিংশ শতাব্দীর মুসলমান সাহিত্য সাধকদের মধ্যে মীর মশাররফ হোসেনই একজন সার্থক এবং শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক হিসাবে এযাবৎকাল সমগ্র বাংলাসাহিত্যে সম্মান পেয়ে আসছেন।

তিন

বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য বাউলের একতারাকে বাদ দিয়ে অসম্পূর্ণ। তাই আবহমান বাংলার লোকসংস্কৃতির ধারায় বাউল সম্প্রদায় পুষ্ট হয়েছে তাদের সঙ্গীত ও সাধনা দিয়ে। এই লোকায়ত বাউল গান আমাদের মানব জীবনের এক অপূর্ব ভাব-মানসের সঙ্গীত বলে পরিচিত। অন্য কোন সঙ্গীত শাখা এই রকম ভাবে আমাদের উত্তাপিত করতে পারেনি। বাঙালীর মনে বাংলার বাউল গান আশ্চর্যজনক ভাবে সঞ্চরণশীল।

চৈতন্যদেবের মৃত্যুর পর অর্থাৎ বৈষ্ণব ধর্মের পরে লোক-মানসে বাউল সম্প্রদায়ের লৌকিক পরিচিতি এবং তার প্রভাব উল্লেখযোগ্য একটি অধ্যায়। বিশেষত চৈতন্যদেবের আবির্ভাব না ঘটলে বাঙালীর জীবন, সাহিত্য, সংস্কৃতি এবং ধর্মীয় অধ্যায়টি অন্যভাবে পাওয়া যেত। তাঁর সৃষ্ট প্রেমধর্মের প্লাবন কতটা বাঙালীর জীবন, জীবন প্রবাহকে পরিবর্তিত করেছিল তার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে বাংলার অধিকাংশ লোকধর্মের বিস্তৃতি চৈতন্যদেবেরই প্রত্যক্ষ নয়ত পরোক্ষ প্রভাবজাত। তাই চৈতন্যদেবের প্রভাব থেকে বাংলার বাউলরাও মুক্ত হতে পারেনি।

---

১. ডঃ আনিসুজ্জামান; 'মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য' থেকে উদ্ধৃত।

কারা এই বাউল, কোথা থেকে এল, কি তাদের পরিচয় এসব ইতিহাস অজ্ঞাত না হলেও বিতর্কিত। আমরা বাউল বলি কাকে? খুব সহজ সরল ভাবে বলতে পারি—সাংসারিক জীবনবোধে উদাসীন, অতিমাত্রায় মনের মানুষের খোঁজে ঈশ্বর প্রেমে পাগল, যারা বাঁধনহীন জীবনচর্চায় মনকে প্রাধান্য দেয় বেশী তাদেরই বাউল বলা যেতে পারে। মনকে কেন্দ্র করে অর্থাৎ মন থেকে সমস্ত জিজ্ঞাসা শুরু এবং সূক্ষ্ম আধ্যাত্ম ভাবলোকে অবস্থান করে বাউলরা।

'বাউল' শব্দের উৎস খুঁজতে গেলে নানা পণ্ডিত, গবেষকদের বিভিন্ন মতের শিকার হতে হয়। কেউ বলে থাকেন, বাউল 'বজ্রকুল' শব্দ থেকে এসেছে, কোন কোন গবেষক বাউল হিন্দী 'বাউর' শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়েছে বলে মনে করে থাকেন। বায়ুর মত ভক্ত ভগবানে যদি লীন হয়ে যেতে পারে, তবে তিনি অবশ্যই বাউল হয়ে উঠবেন, তখন তার নিজস্ব কোন অস্তিত্ব অনুভূত হবে না। তবে বেশীর ভাগ গবেষকগণ সংস্কৃত 'বাতুল' শব্দের থেকে বাউল শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে একমত। 'বাতুল' অর্থ যারা ক্ষেপা, পাগল, গৃহী-জীবনের সাথে যাদের কোন যোগ নেই। তাই বাউল জীবন ও বাউল গান ক্ষেপামী, পাগলামী মাদকতাপূর্ণ পরিস্থিতি এবং পরিবেশের উপর নির্ভরশীল বলে মনে হয়।

'বাউল' শব্দটি নূতন কোন শব্দ নয় বা হঠাৎ-হওয়া কোন সম্প্রদায় নয়। এর প্রাচীন পরিচয় মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থে পাওয়া যায়। এছাড়া চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, 'চৈতন্যচরিতামৃত', 'শূন্য সংহিতা'র (ওড়িয়া পুঁথি) বিভিন্ন স্থানে বাউল শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। ক্রমবিকাশের ধারায় দেখা যায় বাউলরা প্রথমে হয়তো একটি বিশেষ ধর্মভিত্তিক অবস্থায় থাকলেও পরে নানা সম্প্রদায়ের ভাঙ্গন ও পরিবর্তনশীল অবস্থার ভিতর দিয়ে এই সম্প্রদায় চৈতন্যদেবের মৃত্যুর পর নিজস্ব একটি রূপ পরিগ্রহ করেছিল।

বাউল-সাধকদের মোহমুক্ত বলা যায়। ব্যক্তিগত আশা আকাঙ্ক্ষা

বাউলরা অস্বীকার করে থাকে। জীবনের সাথে তাদের যে সম্পর্ক, তা অত্যন্ত সহজ সরল, প্রবল আসক্তিতে আবদ্ধ নয়। তাই বাউল মুক্ত, বন্ধনহীন জীবনের প্রতীক। জাত বিচারের তুচ্ছতা এদের স্পর্শ করতে পারেনি। মানবতত্ত্ব এদের মৌলিক বিষয়। এরা মানবতাবাদী। হিন্দু, মুসলমান উভয় ধর্মের লোকই বাউল সম্প্রদায়কে করেছে মহান, উদার। বাংলার মাটিতে সংসার বিচ্ছিন্ন, চলমান একটি সঙ্গীত সম্প্রদায় এই বাউল।

বাউলদের নিজস্ব ধর্ম বলে বিশেষ কোন ধর্মমত প্রচলিত থাকলেও সেই ধর্ম এবং তার বিধি-বিধানের কথা বাউলরাই বলতে পারে। আনুষ্ঠানিক কোন ধর্মের আড়ম্বর বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা যায় না। বাউলদের ধর্মের তত্ত্ব ও দর্শন এবং সাধন পদ্ধতির নিয়ম কানুন বহু অভিজ্ঞতা দিয়ে অর্জন করা জীবনের উপলব্ধি, তারা তাদের গানে প্রকাশ করে থাকে। মরমী কবি দুদ্দু শাহ্‌র এরকম একটি গানে পাওয়া যায় ঃ

বাউল জীবনকে জানতে কয়।
কেমন জীবন-বস্তু, কিসে জন্ম লয়॥
যে বস্তু জীবনের কারণ।
তাই বাউল করে সাধন
জীবন পরম নিরূপণ—বাউলেরা কয়॥

প্রকৃত অর্থে বাউল গান বলতে বাউল সাধক সম্প্রদায়ের তত্ত্ব-দর্শন সাধন সম্বলিত গানকেই প্রকৃত বাউল গান হিসাবে ধরা হয়ে থাকে। বাউল তত্ত্ব-দর্শনের অন্তর্গত রহস্যের স্বাদ পাওয়া যায় শেখ্ মদনের একটি গানে ঃ

যদি করছ মানা ওগো বন্ধু
মানি এমন সাধ্য নাই।
আমার নামাজ আমার রোজা
গানে গানে চলছে তাই।

কোন ফুলের নামাজ রং বাহারে,
কারো গন্ধে নামাজ অন্ধকারে
আবার বীণায় নামাজ তারে তারে
আমার নামাজ কণ্ঠে গাই।

বাংলার দিগন্ত বিস্তৃত প্রকৃতি ও পরিবেশের মধ্যে বাংলার বাউল সাধকেরা তাদের অধ্যাত্ম চিন্তার অভিনব প্রকাশ ঘটিয়েছে তাদের সুর ও বাণীতে। বাংলার বাউল কবিরা জীবনের গভীর সত্যকে সহজ সুরে, সহজ ভাবে তত্ত্ব কথায় প্রকাশ করেছে। সেই সহজ কথা, সহজ সুরের বাউল গান বাঙালীর সঙ্গীত জগতের জাতীয় সঙ্গীত হিসাবে পরিচিত,—যার আবেদন প্রাণে, হৃদয়ের গভীরে। বাংলার লোকসাহিত্যে এমন সহজ সুরের গান আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। রবীন্দ্রনাথ বাংলার বাউলের গানের প্রসঙ্গে বলেছেন:

> এমন বাউলের গান শুনেছি, ভাষার সরলতায়, ভাবের গভীরতায়, সুরের দরদে যার তুলনা মেলেনা, তাতে যেমন জ্ঞানের তত্ত্ব, তেমনি কাব্য রচনা,...তেমনি ভক্তির রস মিশেছে। লোকসাহিত্যে এমন অপূর্বতা আর কোথাও পাওয়া যায় বলে বিশ্বাস করিনে।

নিরক্ষর গ্রাম্য বাউল কবিরা যেভাবে আমাদের দেশের মানুষকে সুরে, ভাবে, ছন্দে উজ্জীবিত করেছিল তার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল।

বাংলার লোকসাহিত্যের ইতিহাসে বাউলরা একটি বিশেষ লোক-ধর্মের সম্প্রদায় হিসাবে পরিচিত হয়ে আসছে। বৈষ্ণব ধর্মের পরে এই ধর্ম সম্প্রদায়ের মতবাদ ও তাদের রচিত বাউল গান বাংলার জনমানসে গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হয়েছিল—বিশেষ করে কুষ্টিয়ায়। কুষ্টিয়া ছিল বাউল প্রভাবিত এলাকা। এই অঞ্চল থেকেই এক সময় বাউল ধর্মের প্রসার ও প্রচার ঘটেছিল। এ প্রসঙ্গে ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মন্তব্য:

> কুষ্টিয়া অঞ্চল কেবল ভৌগলিক সংস্থানের জন্যই নহে,

অন্যান্য বিশেষ কারণেও নদীয়া, যশোহর, ফরিদপুর, পাবনা প্রভৃতির ধর্ম-সাধনা-বিষয়ে অনুপ্রেরণারও একটি কেন্দ্রস্থল।···কুষ্টিয়া অঞ্চল হইতেই এই ভাবধারা চতুর্পার্শ্ববর্তী জেলায় ছড়াইয়া পড়ে এবং অনেক মুসলমান ও হিন্দু জাতীয় বাউলের উদ্ভব সম্ভব হয়।

শুধু বাউল বৈষ্ণবদের উদ্ভব ক্ষেত্র হিসাবে নয়, লোকসাহিত্যের অন্যান্য বিষয়েও কুষ্টিয়ার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। কুষ্টিয়ার শিলাইদহে অবস্থান কালে রবীন্দ্রনাথ অনেক বাউল ও বৈষ্ণব সাধকদের সান্নিধ্যে আসেন এবং ঐ অঞ্চল থেকেই তিনি এক সময় লোকসাহিত্যের বহু মূল্যবান মণিমুক্তা সংগ্রহ করেছিলেন। কাঙাল হরিনাথ, গগন হরকরা, গোঁসাই গোপাল, সর্বক্ষেপী বোষ্টমী এবং লালনের শিষ্যদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ প্রায় সময়েই আলাপ আলোচনা করতেন। তবে লালনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ ঘটেছিল কিনা সঠিক জানা যায় না।

মরমী সাধনার ক্ষেত্রে কুষ্টিয়ার মাটি বাউল বৈষ্ণবদের প্রভাবিত করেছে। এখানে যেমন বাউল বৈষ্ণবের আস্তানা ছিল তেমনি এই অঞ্চলে এদের বিরুদ্ধেও এক শ্রেণীর মানুষ সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে বাউল বিরোধী আন্দোলন করেছিল, এইরকম নানাভাবে বাউল বৈষ্ণবদের প্রভাব কুষ্টিয়ার কবি-সাহিত্যিকদের ওপর পরেছিল।

উনিশ শতকের শেষ দিকে সাধক শ্রেণীর বাউল সম্প্রদায় ছাড়াও 'শখের বাউল' গান রচয়িতাদের আবির্ভাব ঘটে। 'শখের বাউল' কবিরাও তাদের বাউল গানগুলি ভগবৎ প্রেম ও ভক্তির, জীবাত্মা-পরমাত্মার স্বরূপ, সংসারের অনিত্যতা প্রভৃতি বিষয়কে অবলম্বন করে লিখেছে। এইসব কবিদের গানে সমসাময়িক কালের সমাজচিত্র ফুটে উঠতে দেখা যায়। এই 'শখের বাউল' দল গঠনের ক্ষেত্রে কুষ্টিয়ার ভূমিকা সাহিত্যের ক্ষেত্রে অপরিসীম।

'শখের বাউল' কবিদের মধ্যে কুষ্টিয়ার কুমারখালির হরিনাথ

মজুমদার শ্রেষ্ঠ ছিলেন। হরিনাথ মজুমদার নাম হলেও তাঁর পরিচিতি কাঙাল হরিনাথ হিসাবেই। এছাড়া পাবনা অঞ্চলে গোলকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্থান উল্লেখযোগ্য ছিল। হরিনাথ মজুমদার 'কাঙাল' বা 'ফিকিরচাঁদ' এবং গোলকচন্দ্র 'দীন বাউল' ভণিতায় গান লিখেছেন। কাঙাল হরিনাথ একসময় সংঘবদ্ধ ভাবে সাহিত্যচর্চা করে একটি যুগের প্রতিনিধিত্ব করে গেছেন। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, জলধর সেন, দীনেন্দ্রকুমার রায়, তন্ত্রাচার্য্য শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব, মীর মশাররফ হোসেন এঁরা প্রত্যেকেই কাঙালের সাহিত্য পাঠশালার ছাত্র ছিলেন।

কাঙাল হরিনাথ ১৮৮০ সালে 'ফিকিরচাঁদ ফকিরের দল' নামে একটি বাউল গানের দল গড়ে ছিলেন। এই বাউল গানের দল গড়ার পিছনে যতদূর মনে হয় লালন ফকিরের প্রভাব কোনো না কোন দিক দিয়ে কাজ করে গেছে। এ প্রসঙ্গে কাঙাল শিষ্য জলধর সেনের বক্তব্যে জানা যায়ঃ

> একবার গ্রীষ্মের সময় শ্রীমান অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ভায়া বাড়ীতে (কুমারখালী) আসিয়াছেন। তিনি তখন বি. এল পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। আমি তখন স্কুল মাস্টার। আমারও গ্রীষ্মাবকাশ। আমরা তখন বাড়ীতে বসিয়া কাঙ্গালের বড় সাধের গ্রামবার্ত্তা প্রকাশিকা পত্রিকার সম্পাদন করি, আর অবসর সময় আমোদ আহ্লাদে কাটাইয়া দিই।
>
> এই সময়ে একদিন মধ্যাহ্নকালে গ্রীষ্মের জ্বালায় অস্থির হইয়া গ্রামবার্ত্তার 'কপি' লেখা পরিত্যাগ করিয়া আমরা হাত পা ছড়াইয়া বিশ্রাম করিতেছি। স্থান গ্রামবার্ত্তার অফিস, অর্থাৎ কাঙ্গাল হরিনাথের চণ্ডিমণ্ডপের একটি কক্ষ। উপস্থিত শ্রীমান অক্ষয় কুমার, গ্রামবার্ত্তার পিণ্টার (এক্ষণে পরলোকগত) প্রফুল্ল চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, কুমারখালী বাঙ্গালা

স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং ছাপাখানার ভূতের দল। ভূতের দল ব্যাকরণ বা সাহিত্যে পণ্ডিত ছিল না, কিন্তু তাহারা সকলেই বেশ গান করিতে পারিত, কারণ তাহারা সকলেই কাঙ্গালের শিষ্য। চুপ করিয়া শয়ন করিয়া থাকা আমাদের কাহারও কোষ্ঠীতে লেখে না। সেই দ্বিপ্রহরে রৌদ্রের মধ্যে কি করা যায়, ইহা লইয়াই একটা তর্ক আরম্ভ হইল। তর্ক বেশ চলিতে লাগিল, কিন্তু কর্তব্য স্থির হইল না; তর্কের যাহা গতি হইয়া থাকে তাহাই হইল। অক্ষয় বলিলেন যে, "একটা বাউলের দল করিলে হয় না?" এ কথাটা মনে হইবারও একটা কারণ ঘটিয়াছিল। সেদিন প্রাতঃকালে লালন ফকির নামক একজন ফকির কাঙ্গালের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন।...সেই লালন ফকির কাঙ্গালের কুটীরে, আমরা যেদিনের কথা বলিতেছি, সেইদিন আসিয়াছিলেন এবং কয়েকটি গান করিয়াছিলেন।

...প্রাতঃকালে যখন গান হয়, তখন আমরাও সেখানে উপস্থিত ছিলাম, গানও শুনিয়াছিলাম। কিন্তু আমরা যে সে গানের মর্ম ধরিতে পারিয়াছিলাম তাহা বলিতে পারি না। দ্বিপ্রহরের সেই রৌদ্রে শ্রীমান অক্ষয়ের মনে হয়ত হঠাৎ লালন ফকিরের গানের কথা উদয় হইয়াছিল, তাই সে বলিয়া বসিল, একটা বাউলের দল করিলে হয় না? সকলেই তখন বলিয়া উঠিলেন, বেশ বেশ।

কাঙালের এই বাউল গানের দলে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, জলধর সেন, প্রফুল্ল গাঙ্গুলী, মীর মশাররফ হোসেন দীনেন্দ্রকুমার রায়, শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব প্রমূখ কবি ও সাহিত্যিক সকলেই যুক্ত ছিলেন। এঁরা প্রায় প্রত্যেকেই গান রচনা করতে এবং গাইতে পারতেন। একমাত্র জলধর সেন বাদে প্রত্যেকেরই কিছু না কিছু গান তৎকালে প্রচলিত

ছিল। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের, 'ভাবমনদিবানিশি, অবিনাশি সত্যপথের সেই ভাবনা' এই গানটি তখনকার দিনে প্রচলিত ছিল। প্রফুল্লকুমার গাঙ্গুলীর গানেরও প্রচলন ছিল। অবশ্য কাঙাল হরিনাথই একমাত্র অজস্র গানের রচয়িতা। প্রায় সহাস্রাধিক গান তিনি রচনা করেছেন। কাঙালের পরমার্থসূচক গানগুলি বাংলা সাহিত্যের এক মূল্যবান সম্পদ।

হরিনাথ (কাঙাল) এক সময় একের পর এক গান বচনা করে তাতে সুর দিয়ে দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর গানগুলি যেমন হৃদয়স্পর্শী তেমনই মর্মগ্রাহী। যেমন—

ওহে, দিন ত গেল, সন্ধ্যা হ'ল পার কর আমারে !
তুমি পারের কর্তা, শুনে বার্তা, ডাকৃচি হে তোমারে ?
আমি আগে এসে, ঘাটে রইলাম ব'সে,
(ওহে আমায় কি পার করতে নাহে; আমি অধম ব'লে)
যারা পাছে এল, আগে গেল, আমি রইলাম প'ড়ে ?....

অথবা

ভবে আসা যাওয়া আজব কারখানা
তুমি প'ড়ে শুনে চোখে দেখে, তবু হয়ে রলে কানা।

কাঙালের এই সমস্ত গান এক সময় দেশের মধ্যে জনপ্রিয় হয়েছিল। এই গানগুলির মধ্যে কাঙালের কবিত্ব শক্তির পরিচয় পরিষ্কার হয়ে ওঠে।

কাঙাল হরিনাথের পরিচয় সাহিত্যিক, সাংবাদিক, শিক্ষক, সমাজ সংস্কারক, সাধক ও বাউল গানের রচয়িতা হিসাবে। কাঙালের গান প্রসঙ্গে জলধর সেন বলেছেন ঃ

> কাঙাল হরিনাথ পূর্ব-বঙ্গের আবাল বৃদ্ধ বণিতার নিকটে তাঁহার বাউল সঙ্গীতের দ্বারাই অসামান্য লোক বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। এই বাউল সঙ্গীতের সহজ সরল প্রাণস্পর্শী কথায় শিক্ষিত অশিক্ষিত সর্বশ্রেণীর লোকই মুগ্ধ

হইতেন। অল্পদিনের মধ্যে বাউল সঙ্গীতের মধুর উদাস
সুর হাটে, ঘাটে, মাঠে নৌকাপথে সর্বত্রই শ্রুত হইত।

ঢাকা ও আসাম অঞ্চলে এক সময় কাঙালের গান বিশেষ জনপ্রিয় হয়েছিল। অনেকে কাঙালের বাউল গানকে শখ করে লেখা এবং কৃত্রিম বলে উল্লেখ করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে সুরেশচন্দ্র মৈত্রের মন্তব্য :

> কাঙালের গানকে কেউ কেউ কৃত্রিম 'বাউল গান' বলেছেন, কিন্তু কাঙালের সাধক জীবন কৃত্রিম নয়। এ বিষয়ে বাংলার দুই সর্বজন সাহিত্য রথী অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, জলধর সেন, সাক্ষ্য দিয়েছেন। উভয়ই কাঙালের সাহিত্য পাঠশালার ছাত্র। কাঙালের আধ্যাত্ম জীবন যদি আন্তরিক ও অকপট হয় তবে তাঁর বাউল গানগুলি নিশ্চয় কৃত্রিম নয়।··· কাঙাল হরিনাথের গান ভবিষ্যতের কাব্যের এবং বিশেষ ভাষা সৃষ্টির উপকরণ সর্ববাহ করল। গদ্যাত্মক শব্দ নয়, পদ্যেরই নিজস্ব একান্ত শব্দ এই বাউল গান সঙ্গীতের উপকরণ, সম্পদ। সেই গান ও শব্দ সম্ভার তাঁকে কেন্দ্র করেই শিক্ষিত সমাজের প্রবেশাধিকার পায়।

কাঙালের বাউল গান সম্পর্কে তাই কোন সন্দেহ থাকতে পারে না।

মীর মশাররফ হোসেনও এক সময় অল্প কিছু বাউল গান রচনা করেছিলেন। তাঁর বাউল গানগুলি 'মশা' ভণিতা দিয়ে লেখা। মীরের সঙ্গীত রসবোধের পরিচয় তাঁর জীবন পরিচিতির মধ্যে লক্ষ্য করেছি। গান বাজনা তাঁর প্রিয় ছিল; বোধকরি বিষয়টি তাঁর শৈশব জীবনে পদমদীর নবাব বাড়ি থেকে প্রাপ্ত। মীরের জীবনের নানা অভিজ্ঞতা এবং নানা ঘটনার প্রভাব তাঁর সাহিত্যের মানস গঠনে সাহায্য করেছে। সুরা, নারী, আমোদ উল্লাসের যাবতীয় স্বেচ্ছাচারিতাময় জীবন তাঁর সাহিত্যকে ব্যাপক ভাবে প্রভাবান্বিত

করেছিল। তাঁর দ্বিতীয় পত্নী কুলসুম সঙ্গীতপ্রিয় ছিলেন। বোধহয় গান রচনার ক্ষেত্রে বিবি কুলসুমের প্রেরণা এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকবে। অন্যদিকে কুমারখালির হরিনাথ মজুমদার (কাঙাল হরিনাথ) মীরের সাহিত্য গুরু হিসাবে পরিচিত ছিলেন। হরিনাথের প্রেরণা ও উৎসাহে মীর মশাররফ হোসেন বাউল গান রচনার দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কাঙাল হরিনাথের সময় কুমারখালি ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় বাউল গানের ব্যাপক প্রচলন ছিল। তা ছাড়া কাঙাল হরিনাথ ছিলেন লালনের প্রতিবেশী। কুমারখালির নিকটবর্তী ছয় সাত মাইল দূরে কালীগঙ্গা নদীর তীরে ছেঁওরিয়ায় আখড়া করে বাস করতেন বাউল ব্যক্তিত্বের শ্রেষ্ঠ সাধক লালন ফকির। লালন-কাঙালের সম্পর্ক ছিল মধুর। লালন বহুবার কাঙালের গৃহে এসেছেন। হরিনাথ ছয়-সাত দিন ধরে লালনকে তাঁর গৃহে রেখে বিভিন্ন ধর্মলাপ করতেন।[১] সেই সময় পাগলা কানাই তাঁর আবেগময়, উদাত্ত কণ্ঠে গান গেয়ে নদীয়া ও তার আশপাশের অঞ্চল প্লাবিত করে বেড়াচ্ছিল। এই সব পরিবেশের মধ্যে বাস করে মীর মশাররফ হোসেনের মনেও বাউল গানের ভাব সম্প্রসারিত হয়ে থাকতে পারে। তাছাড়া মীর মশাররফ হোসেন কাঙালের 'ফিকির চাঁদে'র দলের সঙ্গে বিভিন্ন স্থানে যেতেন। কাঙাল হরিনাথ একদিন 'ফিকিরচাঁদে'র দল নিয়ে কুমারখালির সাঁওতা গ্রামে তাঁর শ্বশুরালয়ে গেলে সেখানে লালনের সাথে হঠাৎ করে কাঙালের দেখা হয়ে যায়, তখন মীর মশাররফ হোসেনও কাঙালের সঙ্গে ছিলেন। লালন এবং কাঙাল সেদিন উভয়ে গান গেয়েছিলেন।[২] মীরের বাউল গান রচনার পিছনে ছিলেন কাঙাল হরিনাথ। তাই মীরের

১। জসিমউদ্দীন—'লালন ফকির', 'বঙ্গবাণী', শ্রাবণ ১৩৩৩, প্রাপ্ত তথ্য। তথ্যটির সূত্র সম্পর্কে জসিমউদ্দীন তাঁর প্রবন্ধে কোন আলোচনা করেন নি।

২। কাঙাল পুত্র সতীশচন্দ্র মজুমদারের 'কুড়ানো সঙ্গীত' গ্রন্থে একথার সমর্থন পাওয়া যায়।

বাউল গানের মধ্যে কাঙালের প্রভাবই বেশী কাজ করেছে। লালনের গানের প্রভাব মীরের বাউল গানে হয়ত এসে থাকতে পারে অবশ্য সেটার সঙ্গত কারণ কাঙাল-লালনের সম্বন্ধ থেকেই, যেহেতু লালনের সঙ্গে কাঙালের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল। এ প্রসঙ্গে মুনীর চৌধুরীর মন্তব্য ঃ

> স্পষ্টতই মনে হচ্ছিল যে কাঙাল হরিনাথের জীবন-চেতনা বরাবর এক তালে চলেনি, লালন ফকির এসে তার মূলে মোচড় দিয়ে গেছেন। মীর সাহেব উভয় স্তরেই কাঙালের সুহৃদ ছিলেন।

তবে লালন, কাঙালের সাধক জীবনের উপর সরাসরি কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তার পরিমাপ করা সম্ভব নয়, কারণ আত্ম-অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে কাঙালের শক্তি-তত্ত্বের পদ ও বাউল গানের পদ একই মানসলোক থেকে উঠে এসেছে বলে মনে হয়। মীরের সঙ্গে লালনের সাক্ষাৎ ঘটে থাকলেও লালন সম্পর্কে কোন কথা বা তাঁর কোন স্মৃতি, মীর মশাররফ হোসেন কোন গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে যাননি বলেই মনে হয়। শুধু মীরের একটি বাউল গানে লালনের উল্লেখ পাওয়া যায়।

> আরে ভাই না পাই দিশে, কলির শেষে,
> কিসে, কার মন মজেছে।
> ফিকির চাঁদে, আজব চাঁদে,
> রসিক চাঁদে সব মেতেছে।
> কোথা আর পাগলা কানাই, লালন গোঁসাই
> সব সাঁই এতে হার মেনেছে।

মীর মশাররফ হোসেন কিভাবে বাউল গান রচনা করলেন, এবং কি ক'রে কাঙালের 'ফিকির-চাঁদ ফকিরে'র দলের সঙ্গে যুক্ত হলেন তার একটি মনোরম বর্ণনা দিয়েছেন কাঙাল শিষ্য জলধর সেন ঃ

> আমি যে সময়ের কথা বলিতেছি, সেই সময়ে একদিন মীর

মশার্‌রফ হোসেন কুমারখালীতে কাঙালের কুটীরে উপস্থিত হইলেন এবং ফিকির-চাঁদের দলকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। কাঙাল সম্মত হইলেন। তিনি বলিলেন, "দলের নিয়মানুসারে দলের লোকেরা তোমার বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিবেন না।... তোমার বাড়ীতে তাঁহারা এক ছিলিম তামাকাও খাইবেন না।" মশার্‌রফ বলিলেন "সে কি রকম কথা! তা কি হয়?" কাঙাল বলিলেন "তবে তুমি যদি এই দলভুক্ত হও, তবে তাঁহারা তোমার বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করিতে পারেন।" মশার্‌রফ হাসিয়া বলিলেন "আমি ত গান করিতে জানি না।" কাঙাল উত্তর করিলেন "গান করিতে জাননা বটে কিন্তু গান ত লিখিতে জান।" মীর মশার্‌রফ বলিলেন তাহা হইলে আমি দলভুক্ত হইলাম। এখনই গান লিখিয়া দিয়া যাইতেছি। এই বলিয়া তিনি তখনই গান লিখিতে বসিলেন।"

কাঙালের বাড়িতে বসে মীর মশাররফ হোসেন ফিকিরচাঁদের দলের জন্য গান রচনা করলেন:

রবে না দিন চিরদিন,
সুদিন কুদিন একদিন দিনের সন্ধ্যা হবে।
আমার আমার সব ফক্কিকার,
কেবল তোমার, নামটি রবে।

এই গানটি রচনার মধ্য দিয়েই তিনি কাঙাল হরিনাথের 'ফিকির-চাঁদ' দলের সদস্য হন। পরবর্তী সময়ে মীরের বাড়ীতে গিয়েও ফিকিরচাঁদ দলের সদস্যরা গান বাজনা করেছিল। একথা পূর্বেই বলেছি যে মীর মশাররফ হোসেন তাঁর বাউল গান রচনায় প্রাথমিক ভাবে প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন কাঙাল হরিনাথের নিকট থেকে। তাছাড়া পরিবেশ ও সময়ের সুত্রটি মীরের শিল্প সাধনার

অনুকূলে ছিল বলেই তাঁর পক্ষে বাউল গীতিকার হয়ে ওঠা সম্ভব হয়েছিল।[১] একথা অস্বীকার করা যাবে না যে লালন, কাঙাল হরিনাথ ও পাগলা কানাই-এর মত প্রতিভা পরিব্যপ্ত পরিবেশে মীর মশাররফ হোসেন বাউল গান রচনার চর্চা করেছিলেন।

মীর মশারফ হোসেনের বাউল গানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভাবে কোন গুহ্য তত্ত্বের কথা প্রকাশ পায়নি। কারণ তিনি বাউল সাধক ছিলেন না। তাঁর গানে সাধন-তত্ত্ব বিষয়ক ক্রিয়াকর্মের ইঙ্গিত খুঁজতে যাওয়াটা নিতান্তই নিরর্থক। অবশ্য এর বাইরে, জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তাঁর দর্শনগুলি গানের মধ্যে চমৎকার ভাবে ফুটে উঠেছে। কখনো বিষণ্নতা, কখনো বিরহ বিচ্ছেদ, কখনো এই অনিত্য সংসার থেকে বন্ধন মুক্তির চেষ্টা, আবার কখনো ষড়রিপুর চক্রে পরে বিপথে যাওয়ার উন্মাদনা, যা মানুষকে শেষ পর্যন্ত কিছুই দেয় না, এইসব বিষয়গুলিই তাঁর গানে প্রধান হয়ে উঠেছে। এই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত মীরের সংকলিত বাউল গানগুলির মধ্যে মূলত দেখা যায় এই অনিত্য সংসার থেকে কিছুই খুঁজে পাওয়া যায় না, কোন কিছুই সঙ্গে যাবার নয়, নিত্য লোকে চলে যাবার সময় সবই থেকে যায়, তাই মানুষের কান্নাহাসি, টাকা-কড়ি, আত্ম-অহংকার এসবের মূল্য মিথ্যে হয়ে যায় মৃত্যুর মধ্য দিয়ে।

বাউল গানের এই আধ্যাত্ম ভাবনাগুলি মীর মশাররফকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল। মীরের বাউল গানগুলির মধ্যেই তাঁর সৃজন ক্ষমতা অধিকতর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। জগতের নিত্যতাকে বাউল সাধকদের মত মশাররফও স্বীকার করেন নি। তাই মশাররফ বলেছেন :

---

১ সাধারণত যারা সাধন ভজনের সঙ্গে সঙ্গে সমাধিস্থ অবস্থায় তত্ত্ব বিষয় নিয়ে মুখে মুখে পদ রচনা করে থাকেন তাদেরকে পদকর্তা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। এছাড়া সাধনা না করেও যারা অনুরূপ গান রচনা করেন তাদেরকে গীতিকার আক্ষয়িত করা হয়ে থাকে।

কে বা কার, তুমি বা কার, কে বা তোমার ;
চিনলে না মন, মনের ফেরে।

এই গানটির সঙ্গে লালনের নিম্নোধৃত গানের যথেষ্ট মিল লক্ষ্য করা যায় ঃ

তুমি কার বা কে তোমার এই সংসারে
মিছে মায়ায় মজে কেন এমন কর রে।

এই অনিত্যতার সংসার থেকে শূন্য হাতে চলে যাবার জন্য মশা বাউল ভয় পেয়ে বলেছেন ঃ

ঐ ছয় চোরের ফেরে, এবার পড়ে
ঘরে কিছু রহিল না।
এখন খালি হাতে, দেশে যেতে,
ভয়ে মশার পা উঠে না।

এই গানটির সঙ্গেও লালনের একটি গানের সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয় ঃ

মন-তরী তার ছ'জন মাল্লায়
সদাই-তারা কুকাণ্ড বাধায়
ডুবালো ঘাটায়
আজ আমাদের ॥

মশা বাউলের গানে যে বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে তা বাংলার অধিকাংশ বাউল সাধকদের গানেরই কথা। মানুষের জীবন নদীকে অতিক্রম করে পারে চলে যাওয়ার দিনের কথা ভেবে মশাররফ লিখেছেন ঃ

মনে কি আছে রে মন, হবে কেমন,
যেদিন হতে হবে পার।
সে যে অকুল পাথার, নাই পারাবার,
সাধ্য বা কার, হয় রে পার।
বিনে তার কৃপাতরী, সুকাণ্ডারী,
নিয়োজিত কর্ণধার।

এই গানের সাথে কাঙাল হরিনাথের ঃ

ওহে দিন তো গেল, সন্ধ্যা হল, পার কর আমারে
তুমি পারের কর্তা শুনে বার্তা, ডাকছি হে তোমারে।

গানটির ভাবগত ঐক্য পাওয়া যায়। এরকম মীরের অনেক গানে লালন কাঙালের গানের ব্যাপক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

পূর্বেই বলেছি বাউলদের কোন জাত-ধর্ম বলে কিছু নেই। যে কোন সম্প্রদায়ের ধর্মীয় গণ্ডিকে অতিক্রম করে মানুষের জন্য মহামিলনের একটি স্থান বাউলেরা নির্মাণ করেছে। জাত বিচারের তুচ্ছতা বাউলদের স্পর্শ করতে পারেনি। লালনের গানে দেখি :

জাত না গেলে পাই নে হরি
কি ছার জাতের গৌরব করি।

পাগলা কানাইও গেয়েছেন :

মালা পৈতা একজন ধরে,
কেউবা সুন্নত করে।
তবে ভায়ে ভায়ে মারামারি করে
যাচ্ছিস কেন সব গোল্লায় ॥

মীর মশাররফের বাউল গানের মধ্যেও সেই ভাবেরই কিছু কিছু বহিঃপ্রকাশ হতে দেখি :

আরে নাই ভেদাভেদ, বর্ণ বিভেদ
কিছু প্রভেদ, কাছে তারি,
মশা কয়, ধোকায় পড়ে বোকা হয়ে
করি আমরা মারামারি ॥

মোল্লা পুরুতের আচার আচরণের প্রতি যথেষ্ট ক্ষোভ মীর তাঁর গানের মধ্য দিয়ে পরিষ্কার ভাবে ব্যক্ত করেছেন। মীরের আক্রোমণাত্মক ভাষার মধ্যে পরিষ্কার হয়ে ওঠে মোল্লা পুরুতের চেহারা। 'দু এক গণ্ডা পয়সা পেলে' এই সব শ্রেণীর মানুষগুলি ধর্ম কর্ম বাদ দিয়ে সব কিছু করতে পারে। 'মশা বাউল' তাই সাবধান বাণী উচ্চারণ করে বলেছেন :

ভাল নয় ভাই বাড়াবাড়ি,
একদিন যেতে হবে যমের বাড়ী,
টাকা কড়ি, জোড়ের জারি, তথায় খাটবে না।
ক্ষুদ্র জীব মশার কথায় রাগ কর না।

এছাড়া রাজা রামমোহন রায়ের ব্রহ্ম সঙ্গীতের সঙ্গে মীরের গানের সাদৃশ্য লক্ষ্যণীয়—রামমোহন লিখেছেন :

মনে কর শেষের সেদিন ভয়ঙ্কর,
অন্যে বাক্য কবে, কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।

মীর মশাররফ হোসেনও সেই একই ভাবনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে লিখেছেন :

তোমার আত্ম স্বজন, ভাই পরিজন
হায় হায় করে কাঁদবে সবে
তারা পেয়ে ব্যথা, ভাঙ্গবে মাথা,
তুমি কথা না কহিবে॥

মীর মশাররফ হোসেনের (এই গ্রন্থে সংকলিত) বাউল গানগুলির মধ্যে ১: নম্বর গানটি সব চাইতে দীর্ঘ এবং গানটির মধ্যে কাঙাল হরিনাথের প্রত্যক্ষ প্রভাব পরিষ্কার ভাবে ফুটে উঠেছে। ঈশ্বর সর্বত্র বিরাজমান। সমস্ত কিছুর মধ্যে সেই পরম সত্তার উপস্থিতি, যিনি সত্য হিসাবে আমাদের সম্মুখে বিরাজমান, তাকেই তিনি সর্বত্র লক্ষ্য করেছেন। এছাড়াও গানটির মধ্যে কুষ্টিয়া অঞ্চলসহ বেশ কয়েকটি স্থানের নাম ও কতিপয় গুণী লোকের জন্মস্থান ও কর্মস্থানের উল্লেখ পাওয়া যায়। দীর্ঘ গানটির মধ্যে বলা হয়েছে :

ভাব মন তাঁরই চরণ কর স্মরণ
যার নামেতে আগুন জ্বলে।
....
যিনি তোর লাহিনীপাড়ায়, ছেউড়ে, কয়ায়,
চাপড়া, সাওতায়, চর বড়ুলে।

গানের শেষে 'মশা বাউল' বলেছেন :

এ সকল কথার কথা মুণ্ড মাথা,

আবোল তাবোল, পাগলে বলে।
ফিকিরচাঁদ ফকির হয়ে, যাচ্ছে কয়ে
তাইতে মশা গুণগুণালে॥

শেষের ভণিতায় কাঙাল হরিনাথকে (ফিকিরচাঁদ) গুরু হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। উল্লেখিত গানটির পাশাপাশি ফিকিরচাঁদের (কাঙাল হরিনাথ) গানের দু' একটি লাইন লক্ষ্যণীয় :

ভাব মন অধম তারণ, সত্ত শরণ নামাতে পাষাণ গলে
যিনি এই গগন তপন, পাতাল ভুবন,
শূন্য পবন স্থলে জলে !
....
ফিকিরচাঁদ বলে তোরে, করে ধরে
মূলে হারালি ভুলে মূলে।
থুয়ে[১] ধন চালের বাতায়, জল যে হাতড়ায়,
তাকেই লোকে পাগল বলে॥

বাউল সাধনার নামে অশ্লীল কাজকর্মকে মীর মশাররফ হোসেন অনুমোদন করেননি। বাউল সাধনার ক্রিয়াকর্মগুলি হয়ত মীরের ভাব জগতকে আঘাত করে থাকতে পারে। কারণ বাউল গানের নামে বাউল দরবেশদের মারামারি হাতাহাতি দেখে মশা উত্তেজিত হয়েছেন, তাই নির্ভীক চিত্তে প্রকাশ করেছেন :

ওরে ভাই তোরা হয়ে দরবেশ, করিস্ বিদ্বেষ,
এই উপদেশ কে দিয়েছে।
তোদের শিক্ষা গুরু আসল গরু
বলতে মশার ভয় কি আছে॥

মোটামুটিভাবে মীরের বাউল গানগুলি আলোচনা করলে মীর মশাররফ হোসেনের ভাব-মানস সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ থাকে না, অথচ মীরের রচিত বাউল গানগুলির উল্লেখযোগ্য প্রচার কখনো হয়নি।

---

১. থুয়ে—রেখে দেওয়া। সম্ভবত কুষ্টিয়ার আঞ্চলিক ভাষা।

এর কারণ লালন কাঙালের আধ্যাত্মিক প্রতিভার পাশাপাশি মীর মশাররফের বাউল গানের প্রচার প্রবণতা তীব্র হয়ে উঠতে পারেনি। এ সম্পর্কে মীর নিজে অবহিত থাকা সত্ত্বেও বাউল গান রচনায় দিকে ঝুঁকেছিলেন। বোধকরি শখ করে গান রচনা করেছিলেন বলেই প্রচারের প্রয়োজনবোধ করেননি, নিতান্তই লেখার প্রয়োজনে লিখে গেছেন।

বলা বাহুল্য মীর মশাররফ হোসেন গীতিকার হিসাবে নয়, গদ্য শিল্পী হিসাবেই বাংলা সাহিত্যে সমধিক পরিচিত। গদ্য সাহিত্যের ক্ষেত্রেই তাঁর প্রতিভার প্রাধান্য বিস্তার লাভ করেছে, তাই হয়ত মীরের স্বল্প সংখ্যক বাউল গানগুলির স্বতন্ত্র মূল্য নিয়ে কেউই আলোকপাত করার প্রয়োজন বোধ করেননি। অথচ মীর মশাররফের গীতি রচনার ক্ষেত্রে 'সঙ্গীত লহরী'র (প্রথম খণ্ড, ১৮৮৭) অন্তর্ভুক্ত বাউল গানগুলি বাংলার বাউল গানের মূল্যবান সম্পদ। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক মীরের বাউল গানগুলিকে আজ পর্যন্ত কোন সঙ্গীত গ্রন্থে সংকলিত করা হয়নি। বাংলার বাউল গানের পাশাপাশি মীর মশাররফ হোসেন রচিত বাউল গানগুলিরও উদ্ধরণের প্রয়োজন রয়েছে।

মীর মশাররফ হোসেনের বাউল গানগুলির মধ্যে আমরা তাঁর ভাব জীবনের একটি মূল্যবান পরিচয় খুঁজে পাই। তিনি যে সময়ে বাউল গানগুলি রচনা করেছেন সেই সময় কালটিতে একদিকে শিক্ষিত শ্রেণীদের মধ্যে যেমন চলছিল নতুন আলোর জোয়ার অন্যদিকে বাংলার বাউল সাধকদের ভেতরে ভেতরে তেমনি চলছিল এক ধরনের উজ্জীবনতা। সেই উভয় স্তরের নবজাগরণের মধ্যে যাঁরা সাহিত্য চর্চা করেছেন তাঁদের প্রায় প্রত্যেকের 'পরেই কম বেশী সমকালীন যুগের প্রভাব প্রত্যক্ষ না হয় পরোক্ষ ভাবে কাজ করে গেছে। কখনো কখনো হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ ভাবটি সাহিত্য, সমাজ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে অশুভ ছায়া বিস্তার

করেছে, যার হাত থেকে সমকালীন কবি-সাহিত্যিকরাও মুক্ত হতে পারেন নি। মীর মশাররফ হোসেন ও সেই প্রভাব থেকে রেহাই পাননি।

যতদূর মনে হয় বাংলার বাউল কবিরা সেই দূষিত রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের মধ্যে বসবাস করেও সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব মুক্ত হয়ে মানবজীবনের জন্য বাউল গান রচনা করে গেছেন। তবে এক্ষেত্রে মীর মশাররফ হোসেনের ভূমিকা শুধুমাত্র বাউল গানের গীতিকার হয়ে ওঠার জন্যে; যার মধ্যে তাঁর অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় ফুটে উঠতে দেখা যায়।

তবে একথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, মীরের অন্যান্য গীতিকর্মের চাইতে বাউল গানের মধ্যেই আমরা অধিক পরিমাণে তাঁর আত্মনিষ্ঠ ভাবানুভূতির প্রগাঢ় আবেগকে পরিপূর্ণভাবে রূপায়ণ হতে দেখি। তাই মীরের গীতিকর্মের উল্লেখযোগ্য কৃতিত্বের পরিচয় গৌরবের সঙ্গে বহন করছে তাঁর বাউল গানগুলি।

মীর মশাররফ হোসেনের বাউল গান

চার

॥ ১ ॥

রবে না দিন চিরদিন,
সুদিন কুদিন একদিন দিনের সন্ধ্যা হবে।

আমার আমার সব ফক্কিকার,
কেবল তোমার নামটি রবে।
হবে সব লীলা সাঙ্গ,
সোণার অঙ্গ, ধূলায় গড়াগড়ি যাবে॥

সংসারের মিছে বাজী,
ভোজের বাজী, সব কারসাজী ফুরাইবে।
মরি এক পলকে, তিন ঝলকে,
সকল আশা মিটে যাবে॥

তোমার আত্মস্বজন, ভাই পরিজন,
হায় হায় করে কাঁদবে সবে।
তারা পেয়ে ব্যথা, ভাঙ্গবে মাথা
তুমি কথা না কহিবে॥

দেখ তোমার এই টাকা কড়ি,
ঘর বাড়ী ঘড়ি গাড়ী পড়ে রবে।
আবার হাত থাকিতে পা রহিতে
পরের কান্ধে যেতে হবে॥

চিরকাল করে হেলা, গেল বেলা,
এখন সন্ধ্যাবেলায় আর কি হবে।
এই জগতের কারণ যিনি,
দয়ার খনি, তিনি মশার ভরসা ভবে॥

॥ ২ ॥

মনে কি আছে রে মন, হবে কেমন,
যেদিন হতে হবে পার।

সে যে অকূল পাথার, নাই পারাবার,
সাধ্য বা কার, হয় রে পার।
বিনে তার কৃপা তরী, সুকাণ্ডারী,
নিয়োজিত কর্ণধার॥

সে ঘাটের তুফান ভারী, ভাঙ্গবে তরী,
খাটবে না আর জারিকার।
কত জাহাজ বজরা যাবে মারা,
সারা হবে চড়নদার॥

কেউ খাবি খাবে, ডুবে যাবে,
পারবে নারে যেতে আর।
কেউ আবার, হেলা করে,
ভেলায় চড়ে হবে পার সেই সাগর॥

মশার প্রাণ উড়ে যায় ঐ ভাবনায়,
কি হবে হায় উপায় এর।
ওরে ভাই সেই দয়াময়, সর্ববিজয়,
বিনে নাহি ভরসা আর॥

॥ ৩ ॥

ভোলা মন! ঘোলায় পড়ে, সুপথ ছেড়ে
করলে এ কি কারখানা।

ঐ যে বেলা গেল সন্ধ্যা হ'ল,
তবু তোমার জ্ঞান হল না।
ঐ সকল চোরের কথায়, যাচ্ছ কোথায়
ফের ফের আর যেও না॥

ও পথ দেখায় ভাল, ও মিছে আলো,
খানিক পরে, আর রবে না।

শেষে, ঘোর আঁধারে ঘুরে ঘুরে
পাবি রে মন ঘোর যাতনা ॥

ঐ ছয় চোরের ফেরে, এবার পড়ে
ঘরে কিছু রহিল না।
এখন খালি হাতে দেশে যেতে,
ভয়ে মশার পা উঠে না ॥

॥ ৪ ॥

কেন আর মিছে ফের, ভেবে মর,
পরের বোঝা মাথায় করে।

তোমার বুদ্ধি শুদ্ধি, সব গিয়েছে,
পড়ে চিড়ের বাইশ ফেরে।
কেবা কার, তুমি বা কার, কেবা তোমার,
চিনলে না মন মনের ফেরে ॥

যারা সব সঙ্গী ছিল, কেউ না র'ল
ছেড়ে গেল, এক এক করে।
তুমি কি সাহসে, কি ধন আশে,
বচ্ছো বোঝা পরের তরে ॥

যাহাদের ভাব আপন, কর যতন,
রাখরে নয়নের পরে।
তারা কেউ কার নয়, সব মিছে ময়
মিছে মায়ার ঘোরে ফেরে ॥

এখন হয়ে সোজা, নামাও বোঝা,
রাগ কর না মশার পরে।
কর সার, সেই সারোৎসার,
সব মূলাধার, সর্ব্ব বিপদ যে জন হরে ॥

॥ ৫ ॥

তুমি এই দেশের রাজা,
করে সাজা সোজা কর কতজনে।

তোমার দণ্ডবিধি, কার্য্যবিধি,
সব বিধি ভাই, সবাই জানে।
জেলখানার কারখানাতে,
প্রাণ ভয়েতে চোর ডাকাতে, তোমায় মানে

আমার মন পাজী, কি কারসাজি,
হয় না রাজী, সুপথ পানে।
বলব কি দুঃখের কথা, ভাঙ্গলে মাথা,
তত্ত্বকথা কানে না শুনে॥

অপরের ভাল দেখি, হয় না সুখী;
এই দুই আঁখি, কি কারণে।
আর একটা, শক্ত ঠেটা,
জিহ্বা বেটা, বাধায় লেঠা কুবচনে॥

শুনে না কার বারণ, শত্রু এমন,
তারা ছজন ছয় দিক টানে।
পেয়ে আর দুজন সহায়,
এই হাত পায়, সারলে আমায় বারজনে॥

মশার এই এজাহার, কর বিচার,
বসিয়ে ধর্ম্মের আসনে।
দিয়ে দেও উচিৎ সাজা, বুঝুক মজা,
হউক সোজা হাল আইনে॥

॥ ৬ ॥

চল মন ষ্টেশনে, টিকিট কিনে,
একবার তারে দেখে আসি।

যার যেখানে হচ্ছে মনে,
যাচ্ছে করে হাসিখুশী।
তোমার কি ভাবনা, ঠিক বল না,
ভাবছ কি আর পথে বসি।
অরে! বাজলে ঘড়ি, আস্‌বে গাড়ী
তান তুপড়ি বান্ধো কষি।
কর কি দৌড়ে চল, করে বল,
যাবে চলে, বাজলে বাঁশী॥
তোমার কি নাই ঠিকানা, পথ চিননা,
জাননা সে কোন দেশবাসী।
ভাল কি সম্বলে, পথে চল,
বল তোমায় তাই জিজ্ঞাসি॥
কতদিন উচট খেলে, দৌড়ে ম'লে,
ছটকে পলে, তিন চার রশি,
এতে আর কোথা যাবে,
কারে পাবে, ভাবে মশা দিবানিশি॥

॥ ৭ ॥

এ ভবের ভাব দেখি ভাই চমৎকার।
তারি লীলে বুঝে উঠা ভার॥
(অরে) পাহাড় জঙ্গল কত নদনদী,
ওরে কৃষ্ণসাগর, মহাসাগর, লালসাগর আদি,
কত সহর নগর, কত সহর নগর,
এই ধরার পর, শূন্যে ঘুরাচ্ছে আবার ॥
(অরে) চন্দ্র সূর্য্য, আকাশের তারা,
ওরে সুনিয়মে শূন্যপথে ভ্রমিছে তারা,
(ভোলা মন) ভ্রমিছে তারা, করে জগত আলো,

জীবের ভাল, আবার করে অন্ধকার ॥

কেউ রাজা হয়ে করিছে দরবার,
কত সেপাই সান্ত্রীরি খাড়া আছে চারিদিকে তাহার,
(ভোলা মন) চারিদিকে তাহার,
কেউ করজোড়ে, কাপড় ঘাড়ে,
দাঁড়ায়ে আছে সামনে তার ॥

কার ধানে ধনে পূর্ণ আছে ঘর,
কেউ এক মুঠ্ অন্নেরই তরে ফিরছে শত ঘর,
(ভোলা মন) ফিরছে শত ঘর,
কেউ শাল বনাতে ঘৃণা করে,
কার ছেঁড়া কাঁথা সার ॥

কার ক্ষীর নবনী ত রুচি নাহি হয়,
কেউ চিটেগুড়ের মিঠের লোভে ঘুরিয়ে বেড়ায়।
(ভোলা মন) ঘুরিয়ে বেড়ায়,
কার ফুল বিছানা,কার ফুল বিছানায়,
ঘুম আসে না, গাছতলায় কার রাত কাবার ॥

কেউ পুত্রশোকে কাঁদিয়া বেড়ায়,
কেউ বিয়ে করে ঘরে আসে বাজী-বাজনায়,
(ভোলা মন) বাজী-বাজনায়,
কার মরা কোলে,—কার মরা কোলে,
কেউ বা বলে, ছেলে হল ভাই আমার ॥

কেউ মনের খোশে হেসে কাটায় দিন,
কেউ দুঃখের ডালি মাথায় করে বচ্ছে চিরদিন,
(ভোলা মন) বচ্ছে চিরদিন,
এ ভবে কেউবা হাসে, কেউবা কাঁদে,
এক ভাবে নাই কেউরে আর ॥

আর সুখে দুঃখের মশার মনে হয়,
ওরে! সকলি তাহারই খেলা, আর ত কিছু নয়,
(ভোলা মন) আর ত কিছু নয়,
জগতের কান্নাহাসি—এই জগতের কান্নাহাসি,
ফাটক ফাঁসী—জরা, মরা, সকলি তার।

॥ ৮ ॥

মিছে ভাই জাতির বিচার, আচার ব্যাভার,
মিছে রে এই দুনিয়াদারী।
দিন কয়েকের জন্য
কেন কর এত বুঝতে নারি॥
তাঁর কাছে নাহি ভিন্ন, কেহ অন্য,
সকলই তাঁর কারিগরী॥
দেখ কৃষ্ণ, বিষ্ণু, মুসা, ইসা,
নানক, নিতাই জটাধারী।
অরে ভাই অন্নপূর্ণা, বিবি ফাতেমা,
মোহাম্মদ পয়দা তাঁরি॥
অরে নাই ভেদাভেদ, বর্ণ বিভেদ,
কিছু প্রভেদ, কাছে তাঁরি।
মশা কয়, ধোকায় পড়ে বোকা হয়ে,
করি আমরা মারামারি॥
আখেরে কিছু রবে না, হবে ফানা,
'আখের ফানা' মনে করি।
এস ভাই সবাই মিলে, দেল খুলে
দেলের ম'লা দূর করি॥

॥ ৯ ॥

ওরে মন ভাবছ কেন অকারণ।
চিরদিন কি সমান যায় কখন॥

জগত-কর্তার কাজে নাইক ভুল,
যে বলে ভুল আছে ভাইরে সেই ত নামাকুল,
(ভোলা মন) দেখ ভাই রবি শশী,
দিবানিশি একভাবে নাই কোনজন ॥

নল রাজার অভাব কি ছিল,
তবে কি দোষে হারায়ে রাজ্য, দময়ন্তী হারাল,
কোথা রাম হবে রাজা, মানবে প্রজা,
সেই করে বনে গমন ॥

আর ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির রাজন,
তের বৎসর বনে বনে করিল ভ্রমণ,
(ওরে মন) করিল ভ্রমণ,
কুরুকুল ধ্বংস হল, কুরুকুল ধ্বংস হল,
সব ফুরাল, উরু ভেঙ্গে দুর্য্যোধন ॥

আর দিনে রেতে জলের জোয়ার বয়,
ভাটার নামে চটে ফেটে অমনি সরে যায়,
(ভোলা মন) অমনি সরে যায়,
সমান কিরে রয় রে টাকা,
সমান কি রয় রে টাকা,
অরে বোকা, ঘরদরজা মজুদ ধন ॥

আর নারীর যৌবন জ্বলন্ত আগুন,
কত পুরুষ পোকা, খেয়ে ধোকা,
পুড়ে হল খুন, (আগুন) পুড়ে হল খুন,
যখন সময় হল, তেজ কমিল,
রক্ষা পেল কতজন ॥

আর ফুলবাগানে কুসুম ফুটিল,
অরে মধু লোভে কত অলি এসে জুটিল,

(ভোলা মন) এসে জুটিল,
থাকে না মধুর গৌরব, থাকে না মধুর গৌরব,
ফুলের সৌরভ, পাপড়ি খসে যায় যখন॥
চাকার মত ঘুরিছে সংসার,
উঁচুনীচু হতেছে ভাই স্বভাবে তাহার,
এতে নাই কার দোষ,
এতে নাই কার দোষ, মনের আফসোস,
মশার সার এই বচন॥

॥ ১০ ॥

ভবে কেউ নাইরে সুখী,
যতই দেখি সবাই দুখী আমার মত।
কি তামাশা, মনের আশা,
পূর্ণ হয় না মনের মত।
এদিকে তেল ফুরাল, দীপ নিবিল,
পড়ে র'ল কার্য্য যত॥
এবারে এই করিব, ঐ ভাঙ্গিব,
আবার ঐ গড়িব দেখছ যত॥
এই সকল ভাঙ্গা চুরয়, গড়া পেটায়,
যাচ্ছে সময় অবিরত॥
যা আছে যার, চাচ্ছে আবার,
দুনিয়ার ভাই মজা এই ত।
মেটে না কার অভাব, যায় না স্বভাব,
যদ্দিন জীবন না হয় গত॥
একটা ছাড়ে, আরটা বেড়ে,
আশায় পড়ে আছে কত।
এতে কি যায় মনোদুঃখ, মনের অসুখ,
মনের কথা ঠিক বল ত?

কেউ মানের আশায়, ধনের চিন্তায়,
প্রাণেরই দায়, ভাবছে কত।
সংসারের বিষম জ্বালা, যায় না বলা,
প্রাণ হল মশার ওষ্ঠাগত ॥

॥ ১১ ॥

ভাব মন তাঁরই চরণ কর স্মরণ
যার নামেতে আগুন জ্বলে।
যিনি এই আকাশ-পাতাল, হস্তী দাঁতাল,
কুড়ের চাল আর ঝাড় জঙ্গলে।
তিনি আবার সিংহ ইন্দুর বিড়াল কুকুর,
দেবতা, ঠাকুর, মানুষের ছেলে ॥
যিনি তোর গাঙ্গের ঘাটে, ধানের মাঠে,
উচ্চ মঠে, মাচির তলে।
তিনি তোর চালের বাতাস, ঘরের কোণায়,
বালিশ কাঁথায় লেপের খোলে ॥
যিনি তোর গলার মালায়, চৈতন ফক্কায়,
ধড়াচুড়া গঙ্গাজলে।
তিনি আবার মাথার খোঁপায়, হাতের বালায়,
নাকের নোলক, পায়ের মলে ॥
যিনি তোর গাড়ু গামছায়, ঘটি-ঘড়ায়,
নেঙটী ভোলে, হাত রুমালে।
তিনি তোর ধামা কাঠায় চালুন ডালায়,
সেরে কুলায় আউড়ি ডোলে ॥
যেনি তোর ঝাল পেটারায়, গাঁঠরী বোচ্কায়,
হাত বাক্‌সে আর গদীর তলে।
তিনি তোর পালঙ্ক খাটে, ছালা চটে,
ঝাঁপীর মাঝে, শিকার ঝোলে ॥

যিনি তোর রন্ধনশালায়, বাহ্যি আলয়,
ঢেঁকিশালে আর গরুর গোলে।
তিনি তোর পূজার ঘরে, দেবমন্দিরে,
নাচ আসরে ছাল্লাতলে॥

যিনি তোর লাহিনীপাড়ায়, ছেঁউড়ে, কয়ায়,
চাপড়া সাঁওতায় চর বড়ূলে।
তিনি তোর গোঁপের মাঝে, কোঁচার সাজে,
চুনট করা উড়নির তলে॥

যিনি তোর আফিং গাঁজায়, কলকে ধূমায়,
লুটকি মেরু হুকোর বোলে।
তিনি আবার আলাপাতায়, মিঠে কড়ায়,
গুড়গুড়ি আর ফুরসীনলে॥

যিনি তোর চিনি পানায়, রসগোল্লায়,
খাজা, গজা, দুধে, ঘোলে।
তিনি আবার গু-গোবরে, রক্তের ধারে,
কফ, কাশি আর আসল জলে॥

যিনি তোর খেঙরা-ঝাঁটায়, খোলা খাপড়ায়,
নুড়ি ঝুড়ি সড়া পাতিলে।
তিনি আবার কোদাল খন্তায়, কাস্তে রামদায়,
খুরপী কাতান দা কুড়ূলে॥

যিনি তোর ভাতের বাটি, হাতের লাঠি,
বাউলি বটি ঢেঁকির আর্সিলে।
তিনি আবার তেলের কেঁড়েয়, ঘিয়ের ভাঁড়ে,
সাদা কাল লাল বোতলে॥

যিনি তোর তালের ডোঙ্গায়, পান্সী নৌকায়,
বড় বাঙ্গলায় খালে বিলে।

তিনি তোর কাটা সরোবর, কূপের ভিতর,
পদ্মানদী গৌরীর জলে ॥

যিনি তোর শশা কলায়, কুল পেয়ারায়,
কুমুর বেগুন লাউ পটলে।
তিনি তোর খেজুর খোরমায়, আঙ্গুর পেস্তায়,
জাম নারিকেল আম কাঁঠালে ॥

যিনি তোর তারকেশ্বরে, মদাপুরে,
কালীঘাটে আর লঙ্কার পুলে।
তিনি আবার এমামবাড়ায়, সাঁইজীর আখড়ায়,
মুস্কিল আসান দরগা তলে।

এ সকল কথার কথা, মুণ্ডমাথা,
আবোল তাবোল পাগলে বলে।
ফিকিরচাঁদ ফকীর হয়ে, যাচ্ছে কয়ে,
তাইতে মশা গুণ গুণালে ॥

॥ ১২ ॥

আরে ভাই না পাই দিশে, কলির শেষে,
কিসে, কার মন মজেছে।

ফিকিরচাঁদে, আজবচাঁদে,
রসিকচাঁদে সব মেতেছে।
কোথা আর পাগল কানাই, লালন গোঁসাই,
সব সাঁই এতে হার মেনেছে।

ছেলেয় বুড়োয়, সং সাজিয়ে,
রঙ্গ লাগিয়ে গান ধরেছে।
তারা বানিয়ে জটা, লাগিয়ে আঠা,
দাড়ি গোঁপে খুব সেজেছে ॥

আবার খেলকা পরে, হুলকা ধরে,
মাজা নেড়ে খুব নাচিছে।

এ সকল উপরি চটক, আলগা ভড়ক,
করে বল ফল কি আছে॥

ওরে আসল ফসল, কিবা নকল,
সকল চাঁদে, দাগ রয়েছে।
এতে কি উত্তর চাপান,
বদ জবান করে গাল দিতে আছে॥

ওরে ভাই তোরা হয়ে দরবেশ, করিস বিদ্বেষ।
এই উপদেশ কে দিয়েছে।
তোদের শিক্ষাগুরু আসল গরু
বলতে মশার ভয় কি আছে॥

॥ ১৩ ॥

ভাইরে একালে কার
আর ধর্ম্ম রইল না।

বামুন কায়েত পাতী নেড়ে,
মিয়ে মোল্লা চাপ দেড়ে,
ভাল বলি বল কারে,
খুঁজে পেলেম না॥

গরু খায় হিন্দু হয়ে,
আবার শূয়োর চাক্ষে মুন্সী ভায়ে,
ভট্টাচার্য্যের মুরগীর আড়ত,
চামড়ার কারখানা॥

ফোঁটা-কাটা বামন ঠাকুর,
নেঙ্গটি কান্দে কদ্‌রে, মজুর,
পাগড়ী মাথায় বুড়ো হুজুর,
কাকেও চেনা যায় না॥

দুই এক গণ্ডা পয়সা পেলে,
এরা ধর্ম্ম কর্ম শিকেয় তুলে,
সকলি করিতে পারে,
কিছু আটকে না ॥

হিন্দু, খ্রীষ্টান, ইস্লাম জাতি,
সকল জেতের এই গতি,
পয়গম্বর, দেবতা আদি,
কেহ আর মানে না ॥

মুসলমান দাড়ি ফেলে,
বামনের পৈতে বালসীর তলে,
শূদ্রের মালা শিকায় তোলা,
আর গলায় নেয় না ॥

কেউ কুড়জালী ঝুলায় গলে,
ওরে মোল্লা বেড়ান কাছা খুলে,
সুযোগ পেলে গাড়ু গামছা
নিতে ছাড়ে না ॥
ঠেটা গুরু ঝুটা পীর,
বালা হাতে নেড়ার ফকীর,
এরা আসল শয়তান, কাফের বেইমান,
তাকি তোমরা জান না ॥

ভাল নয় ভাই বাড়াবাড়ি,
একদিন যেতে হবে যমের বাড়ী,
টাকাকড়ি, জোরের জারি, তথায় খাটবে না,
ক্ষুদ্র জীব মশার কথায় রাগ কর না ॥

———

নির্দেশিকা

পরিশিষ্ট খ

পরিশিষ্ট—গ

মীর মশাররফ হোসেন সম্পর্কিত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ :

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : মীর মশাররফ হোসেন, সাহিত্য সাধক-চরিতমালা, ২৯নং ২য় খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা।

মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল : মীর মশাররফ হোসেন। বাংলা একাডেমী, ঢাকা

: মীর মশাররফের গদ্য রচনা। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মুনির চৌধুরী : মীর মানস। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

কাজী আবদুল মান্নান (সম্পাদিত) : মশাররফ রচনা সম্ভার, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

আবদুল আজীজ আল্-আমান : বিষাদ-সিন্ধু। হরফ প্রকাশনী, কলকাতা।
(সম্পাদিত)

আনিসুজ্জামান : মুসলীম মানস ও বাংলা সাহিত্য। মুক্তধারা, কলকাতা।

কাজী আবদুল ওদুদ : শাশ্বত বঙ্গ, কলকাতা।

আবদুল লতিফ চৌধুরী : মীর মশাররফ হোসেন। সিলেট।

আশরাফ সিদ্দিকী (সম্পাদিত): জমিদার দর্পণ। বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

মহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসন : বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

আহমদ রফিক : মীর মশাররফ, অসাম্প্রদায়িক গণ-চেতনার রূপায়ণ (শিল্প সংস্কৃতি জীবন) ঢাকা।

আজহারউদ্দীন খান : বিলুপ্ত হৃদয়। ডি, এম, লাইব্রেরী, কলকাতা।

ম, মনিরউজ্জামান (সম্পাদিত) : মীর মশাররফ হোসেন, ইতিহাস ঐতিহ্য পরিষদ, কুষ্টিয়া।